সহীহ্ নামায ও দু'আ শিক্ষা

(২য় ও ৩য় খণ্ড)

ঃ প্রণেতা ঃ

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল

(রহিমাহুল্লাহ)

২য় খণ্ডের ভূমিকা

সহীহ্ নামায ও দু'আ শিক্ষা ঃ ২য় খণ্ডের অসাধারণ জনপ্রিয়তার প্রমাণ এই যে, ইতিপূর্বে এর ১ম ও ২য় সংস্করণে বেশ কিছু সংখ্যক কপি ছাপানো হলেও প্রত্যেক মুদ্রণের সকল কপি অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। পাঠক সমাজের প্রবল চাপ সত্ত্বেও নানা কারণে আমি এই খণ্ডটির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে পারিনি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বর্তমানে কাগজের অচিন্তপূর্ব দুর্মূল্যের দিনে তার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এজন্য সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। এতদ্বারা আগ্রহী পাঠক সমাজের চাহিদা সাময়িকভাবে পূরণ হবে বলে আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি। আল্লাহ আমার এই নগণ্য খেদমত কবূল করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন !! ইতি-

বিনীত
গ্রন্থকার

৩য় খণ্ডের ভূমিকা

আল্লাহর ফযলে সহীহ্ নামায ও দু'আ শিক্ষা-১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর ৩য় খণ্ড প্রকাশের জন্য দেশের বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাব আসায় আমি এবার ৩য় খণ্ড প্রকাশে প্রয়াসী হলাম। তবে দ্বিতীয় খণ্ড ২য় সংস্করণ করতে গিয়ে কাগজের মূল্য অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধির দরুণ এবং যেহেতু মোটা হলে পাঠকদের ক্রয়ে কষ্ট হয় বিধায় ২য় খণ্ডের কিছু অংশ ৩য় খণ্ডে সংযোজিত করে ২য় খণ্ড একটু হ্রাসকৃত আকারে এং ৩য় খণ্ড বর্তমান সাইজে প্রকাশ করলাম। অত্র ৩য় খণ্ড সাদরে গৃহীত হলে ধন্য হব। ইতি

বিনীত
গ্রন্থকার-আব্দুল্লাহ্ ইবনে ফযল

প্রমাণপঞ্জি

কালামুল্লাহ

১। কুরআন মজীদ মু'আররা
২। কুরআন মজীদ মুতারজম

তাফসীর

৩। তাফসীর কবীর
৪। তাফসীর খাযেন
৫। তাফসীর ইবনু কাসীর
৬। তাফসীর ফতহুল বয়ান
৭। তাফসীর আল ইতকান
৮। তাফসীর মা'আলিমুত্ তানযীল
৯। তাফসীর জামেউল বয়ান
১০। তাফসীর ইবনে জারীর
১১। তাফসীর মুযেহুল কুরআন
১২। তাফসীর জালালাইন
১৩। তাফসীর আজিজিয়া

হাদীস

১৪। বুখারী
১৫। মুসলিম
১৬। নাসায়ী
১৭। আবু দাউদ
১৮। ইবনে মাজাহ্
১৯। ইবনে জারুদ
২০। মোয়াত্তা মালেক
২১। তাবরানী ছাগীর
২২। আহমদ
২৩। হাকেম মুস্তাদরেক
২৪। দারেমী
২৫। দারকুতনী
২৬। বুলুগুল মারাম
২৭। মাসনাদে ইবনে আওয়ানা
২৮। বায়হাকী
২৯। ইবনে সুন্নী
৩০। ইবনে আবী শায়বাহ
৩১। জামে সাগীর সুয়ুতী
৩২। কিয়ামুল লায়েল
৩৩। জুযুল কেরাত বুখারী
৩৪। তালখিসুল হাবীর
৩৫। আত্ তারগীব ওয়াত তাহরীম
৩৬। বুগুগুল আমানী

শরুহাতে আহাদীস

৩৭। ফতহুল বারী
৩৮। উমদাতুল কারী
৩৯। আওনুল মা'বুদ
৪০। তোহফাতুল আহওয়াযী
৪১। কাশফুল মুগাত্তা
৪২। তাসহীলুল কারী
৪৩। তানকিহুর রুওয়াত
৪৪। মিরআতুল মাফাতিহ
৪৫। আরফুশ শাযী
৪৬। শরহে নাওয়াভী মুসলিম
৪৭। যুরকানী
৪৮। নায়লুল আওতার
৪৯। আরেযাতুল আহওয়াযী
৫০। আত্তা'আলীকুল মুগনী
৫১। মিরকাত

ফিকহুল হাদীস

৫২। যাদুল মা'আদ
৫৩। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা
৫৪। মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ
৫৫। ফিকহুস সুনানে ওল আসার
৫৬। শরহে মা'আনীল আসার
৫৭। আসারুস সুনান
৫৮। কিতাবুল উম,শাফী
৫৯। রওজাতুন্ নাদীয়াহ
৬০। আল মুগনী
৬১। মুহাল্লা ইবনে হযম

ফাতাওয়া

৬২। ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ

৬৩। ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ
৬৪। ফাতাওয়া সাত্তারিয়াহ
৬৫। ফাতাওয়া আলমগীরী
৬৬। ফাতাওয়া সিরাজীয়াহ
৬৭। ফাতাওয়া খায়রিয়াহ
৬৮। ফাতাওয়া শামী
৬৯। ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী
৭০। ফাতাওয়া মিলাদ
৭১। তানকি ফাতাওয়ায়ে হামিদিয়া
৭২। ফাতওয়া আযীযিয়া হ

ফিকহ্ ও
শরাহাতে ফিকাহ

৭৩। রদ্দুল মুহতার
৭৪। দুররে মুখতার
৭৫। নাসবুর রায়াহ
৭৬। গায়তুল আওতার
৭৭। ফাতহুল কাদীর
৭৮। হিদায়াহ
৭৯। আরবাউ ওয়াত তাকমীল
৮০। কানযুদ দাকায়েক
৮১। মালাবুদ্দা মিনহু
৮২। হেদায়াহ
৮৩। শরহে বেকায়াহ
৮৪। শরহে ফেকায়া হ

আসমাউর রিজাল
ও তারিখ

৮৫। মিযানুল ইতেদাল
৮৬। তাকরীবুত তাহযীব
৮৭। তাহযীবু তাহযীব
৮৮। খোলাসা
৮৯। ইবনে হেশাম
৯০। তারিখে কবীর
৯১। ইবনে খলদুন

লোগাত

৯২। কামছুল মুহীত
৯৩। মুগরব
৯৪। মাজমাউল বিহার
৯৫। আল মুনজেদ

আল মুত্তাফারিকাত

৯৬। সিফরুস সাআদাত
৯৭। যররুল কুলুব
৯৮। কাশফুর মাহযুবায়েন
৯৯। মারগুবুল কুলুব
১০০। আযযাজরুশ শাদীদ
১০১। হিছনে হাছিন
১০২। হায়াতুল হায়াওয়ান
১০৩। তুহফাতুল ওদুদ
১০৪। মাজমাউল বেহার
১০৫। তালখীসুল হাবীর
১০৬। তাকবিয়াতুল ঈমান
১০৭। দুররে মুখতার
১০৮। বেহেশতী জেওর উরদু
১০৯। তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ
১১০। আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া
১১১। মিরকাতুল মাফাতীহ
১১২। মুগনী ইবনে কুদামা
১১৩। ইবনে আবী শায়বাহ
১১৪। সুবুলুস সালাম
১১৫। বাযযার
১১৬। মিয়াতে মছায়েল
১১৭। ছেরাতুল মুস্তাকীম
১১৮। মছায়েলে আরবাঈন
১১৯। মাছাবাত বিচ্ছুন্নাহ
১২০। ইসলাহের রসুম
১২১। ফেকায়াহ
২২। মকতুবাতে ইমাম রব্বানি
১২৩। মদখল
১২৪। বরাহিনে কাতেয়া
১২৫। মাদারেজুন নবুয়ত
১২৬। খতিব ইবনে নাজ্জার
১২৭। ইবনে সুন্নী
১২৮। কানযুল উম্মাল
১২৯। হাদিয়াতুল মাহদী
১৩০। কিয়ামুল লাইল

২য় খণ্ডের সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

৩য় খণ্ডের সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

মুনাজাত

অযীফা পাঠ করে মুনাজাত করবে। মুনাজাত করার সময় হস্তদ্বয় মিলিত করে খোলা ভাবে আকাশ পানে মুখের সম্মুখে সিনা বরাবর উঠাবে। অতঃপর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দু'আ করবে।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ও আহমদ)

প্রত্যেক ফরয নামাযে জামা'আতের সাথে মুনাজাত করার সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না তবে একাকী এবং নফল নামাযে মুনাজাত করার দলীল আছে।

নামায শিক্ষা ১ম খণ্ডে আমরা মুনাজাতের অধ্যায়ে ১২টি দু'আ লিপিবদ্ধ করেছি। বর্তমান খণ্ডে ১১টি দু'আ উল্লেখ করলাম।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিকাংশ সময় এইসব দু'আ পাঠ করতেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা-তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।

অর্থ ঃ প্রভু হে ! আমাদিগকে হিদায়াত করার পর আমাদের হৃদয় সমূহকে কুটিল হ'তে দিওনা, আর তোমার তরফ থেকে আমাদিগকে প্রদান কর রহমত, বস্তুতঃ তুমিই তো অজস্র দানকারী।

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আমান্না ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়াকিনা 'আযাবান্নার।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু, আমরা ঈমান এনেছি ; অতএব আমাদের পাপরাজি ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে মুক্তি দান কর।

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِي اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাগফির লানা যুনূবানা ওয়াইসরাফানা ফী আমরিনা ওয়া

সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা 'আলাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু পরওয়ারদিগার। আমাদের গুনাহগুলিকে মাফ করে দাও, আমাদের কাজের মধ্যে বাড়াবাড়িগুলিকেও, আর আমাদের পদগুলোকে সুদৃঢ় করে রাখো এবং কাফিরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য মদদ করো।

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আনযিল আলাইনা মায়িদাতাম মিনাস সামায়ি তাকূনু লানা 'ঈদান লিআওয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খাইরুর রাযিকীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু ! আকাশ থেকে আমাদের খাদ্য প্রেরণ কর–যা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য আনন্দোৎসবের কারণে পরিণত হয় এবং তোমার তরফ থেকে নিদর্শনরূপে পরিণত হয় এবং আমাদেরকে রুযী-জীবিকা প্রদান কর আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা।

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাগ ফির লানা যুনূবানা ওয়া কাফ্ফির 'আন্না সায়্যিআতিনা ওয়াতাওয়াফ্ফানা মা'আল আবরার।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব ! আমাদের গুনাহগুলোকে তুমি মাফ করে দাও এবং আমাদের মন্দগুলোকে আমাদের ভিতর থেকে দূর করে দাও আর সৎ ব্যক্তিদের সাথে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।

رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ * উচ্চারণ ঃ রাব্বি ইন্নী মাগলূবুন ফানতাসির।

অর্থ ঃ প্রভু আমাদের ! আমি পরাভূত, সুতরাং তুমি (আমার) সাহায্য কর।

رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আন্নী মাস্সানীয়ায্ যুর্রু ওয়া আনতা আরহামুর রা-হিমীন।

অর্থ ঃ প্রভু হে ! অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করেছে–আর তুমিই হচ্ছ সমস্ত

দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াশীল (সুতরাং তা দূর করে আমার উপর তোমার দয়া ঢেলে দাও)।

رَبَّنَا اٰتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতাওঁ ওয়া হাইয়ি লানা মিন্ আমরিনা রাশাদা।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব ! তোমার ভাণ্ডার থেকে আমাদেরকে রহমত প্রদান কর। এবং আমাদের কাজে কর্মে সত্য পথ ব্যবস্থিত করে দাও।

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আন্‌যিলনী মুন্‌যালাম মুবারাকাওঁ ওয়া আন্‌তা খায়রুল মুন্‌যিলীন।

অর্থ ঃ প্রভু হে ! বরকতসমৃদ্ধ স্থানে আমাকে স্থান দান কর আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দানকারী।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খায়রুর রা হিমীন।

অর্থ ঃ প্রভু হে ! ক্ষমা কর এবং দয়া কর, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়াশীল।

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাসরিফ আন্না আযাবা জাহান্নামা ইন্না আযাবাহা কানা গারামা।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব ! জাহান্নামের শাস্তিকে আমাদের নিকট হতে দূরে সরিয়ে নাও, নিশ্চয় দোযখের শাস্তি অতীব কঠিন।

মাতা-পিতার জন্য দু'আ

رَبِّي اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা

ইয়াকূমুল হিছাব।

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! যে দিবস হিসাব অনুষ্ঠিত হবে আমাকে সেই দিবসের জন্য মাফ কর, আমার পিতামাতাকে মাফ কর এবং মুমিনদিগকে মাফ কর।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً *

উচ্চারণ ঃ রাব্বিরহাম হুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা।

অর্থ ঃ প্রভু হে ! তাদের উভয়ের (পিতা ও মাতার) উপর রহম কর যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে স্নেহ মমতায় প্রতিপালন করেছেন।

ভাই বন্ধুদের জন্য দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাগ্ ফিরলানা ওয়ালি ইখ্ওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিল ঈমান ওয়ালা তাজ'আল ফী কুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম।

অর্থ ঃ প্রভু হে ! তুমি আমাদিগকে মাফ করো এবং আমাদের সেই ভ্রাতাগণকে মাফ করো, যারা ছিলেন ঈমানে আমাদের অগ্রগামী আর আমাদের অন্তরে মুমিন মুসলমানদের সম্পর্কে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু পরওয়ারদিগার ! নিশ্চয় তুমি হচ্ছ কৃপাশীল দয়ালু।

সন্তান সন্তুতির জন্য দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَاماً *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুররাতা আ'আয়ুনিও ওয়াজ 'আলনা লিলমুত্তাকীনা ইমামা।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব ! আমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান সন্তুতিকে আমাদের চোখের ঠাণ্ডক (স্নিগ্ধকারী) বানিয়ে দাও (অর্থাৎ তাদের দেখলে যেন আমাদের

চোখ জুড়িয়ে যায়) এবং আমাদের মুত্তাকীনদের ইমাম করে দাও।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বিজ 'আলনী মুকীমাস্ সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতী রাব্বানা ওয়াতাকাব্বাল দু'আ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু ! আমাকে নামাযের প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দাও আর আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও। (অর্থাৎ তাদেরকেও নামাযে কায়েম রাখ)। হে আমাদের প্রভু ! আমাদের দু'আ কবূল কর।

সু-সন্তান লাভের দু'আ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ * উচ্চারণ ঃ রাব্বি হাব লী মিনাস্ সা-লিহীন।

অর্থ ঃ প্রভু হে ! আমাকে সু-সন্তান প্রদান কর।

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বি লা তাযারনি ফারদাওঁ ওয়া আন্‌তা খায়রুল ওয়ারিছীন।

অর্থ ঃ হে প্রভু পরওয়ারদিগার ! আমাকে একা ছেড়ে দিওনা, আর তুমিই তো ওয়ারিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সাইয়্যিদুল ইসতিগফার

অর্থাৎ তাওবার সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ ও তার ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবাদেরকে ফরমিয়েছেনঃ আমি তোমাদেরকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিচ্ছি যে, যে কেউ সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করবে রাত্রেই যদি তার মৃত্যু ঘটে তবে সে জান্নাতী হবে এবং কেউ যদি সকালে এই দু'আ পাঠ করে এবং সন্ধ্যার পূর্বেই মারা যায় তবুও সে জান্নাতী হবে। (বেহেশতের অধিকারী হবে)। (তিরমিযী)

তাওবার শ্রেষ্ঠ দু'আটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ

وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্তানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা 'আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ-উ বিযামবি ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থ ঃ ওগো আল্লাহ ! তুমি আমার প্রভু পরওয়ারদিগার। তুমি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ (তুমি স্রষ্টা)। আর আমি তোমার বান্দা। তোমার সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা করেছি–আমার সাধ্যমত সে সবের উপর (কায়েম) রয়েছি। আমি যে অন্যায় করেছি তার থেকে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আমার প্রতি প্রদত্ত তোমার নেয়ামতের জন্য আমি স্বীকৃতি প্রদান করছি এবং আমার পাপ স্বীকার করে নিচ্ছি; অতএব আমাকে তুমি মাফ করে দাও। কারণ তুমি ভিন্ন গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই।

সার্বজনীন ও ব্যাপক দু'আ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালি জামীইল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি, আল-আহ্ইয়ায়ি মিনহুম ওয়াল আমওয়াত–ইন্নাকা মুজীবুদ্দা'অওয়াত।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা মাতা এবং মৃত ও জীবিত সমস্ত মু'মিন মুসলমান নর-নারীকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী।

খাস দু'আ এবং ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর অযীফা

নিম্নলিখিত দু'আগুলি ফজর ও মাগরিবের ফরযের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিকাংশ সময়েই পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَانِيْ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা 'আফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুনইয়ায়ী ওয়া আহ্লী ওয়া মালী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দ্বীন ও দুনিয়ার এবং পারিবারিক ও আর্থিক নিরাপত্তা কামনা করি। (নাসায়ী)

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَعَنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِعَصَمَتِكَ مِنْ اَنْ اُغْتَالَ تَحْتِيْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতী ওয়া আমিন রাউ'আতী ওয়াহ্ফিযনী বাইনা ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খালফী ওয়া আন ইয়ামীনী ওয়া আন শিমালী ওয়া আন ফাউকী ওয়া আউযু বিইসমাতিকা মিন আন উগতালা তাহ্তী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমার সকল দোষ ঢেকে রেখো এবং ভয়ের জিনিস হতে নিরাপদে রেখো এবং অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম, উর্দ্ধ দিক হতে (সকল ভয়, ত্রাস এবং শত্রুদের আক্রমণ থেকে) হেফাযতে রেখো এবং আমি আমার নীচের দিক হতে (অর্থাৎ মাটির তলদেশ হতে) যেন কোন বিপদে পতিত না হই তজ্জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (নাসায়ী)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিল আরযি ওয়ালা ফিস্সামায়ি ওয়া হুয়াস সামীউল 'আলীম।

অর্থ ঃ "সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যাঁর নামের সাথে (কাজ শুরু করলে) আসমান এবং যমীনের কোন জিনিসই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা।" (নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *

উচ্চারণ ঃ আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত তা-ম্মাতে মিন শাররি মা খালাকা।

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ বাক্যসমূহের সাহায্যে তাঁর সমুদয় সৃষ্টির অনিষ্ট হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ * উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান না-র।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! আমাকে নরকাগ্নি হতে আশ্রয় দান কর।

এই দু'আ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় ৭ বার পাঠ করবে নিশ্চয় সে দোযখ হতে পরিত্রাণ পাবে (আবু দাউদ)

সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াতের ফযীলত

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ আঊযু বিল্লাহিস সামীইল 'আলীমি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম।

যে ব্যক্তি এই দু'আ ৩ বার পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত "হুয়াল্লাহুল্লাযী" হ'তে "আযীযুল হাকীম" পর্যন্ত ১ বার প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের নামায বাদ পাঠ করে থাকে তার মুক্তির জন্য দিবা রাত্র ৭০ হাজার ফিরিশতা দু'আ করেন এবং সেই দিন বা রাত্রে তার মৃত্যু ঘটলে সেই ব্যক্তি শহীদের সওয়াব পাবে। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড ১১৬ পৃষ্ঠা)

"সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত"

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ * هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ * هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِيْ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু ; 'আলিমুল্ গাইবি ওয়াশ্শাহাদাতি হুয়ার্ রাহ্মানুর রাহীম। হুওয়াল্লা হুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহ্ আল্মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল্ মু'মিনুল্ মুহাইমিনুল্ 'আযীযুল জাব্বারুল্ মুতাকাব্বির। সুব্হানাল্লাহি 'আম্মা ইউশরিকূন। হুয়াল্লাহুল্ খালিকুল্ বারিউল্ মুসাওভিরু লাহুল্ আস্মাউল্ হুস্না ইউসাব্বিহু লাহূ মা ফিস্সামাওয়াতি ওয়াল্ আর্যি ওয়াহুয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম।

যে কালিমা দ্বারা দু'আ বেশী কবূল হয়।

يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ * উচ্চারণ ঃ ইয়া যাল জালালী ওয়াল ইকরাম।

অর্থ ঃ হে সর্বশক্তিমান ও মহাসম্মানী। (তিরমিযী)

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ * উচ্চারণ ঃ ইয়া আরহামার রা-হিমীন।

অর্থ ঃ হে পরওয়ারদিগার, শ্রেষ্ঠ করুণাময়। (হাকিম)

যে দু'আ পাঠ করলে গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সওয়াব হয়

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন–যে ব্যক্তি নিম্নের দু'আ পাঠ করবে সে একটি গোলাম আযাদের সমান সওয়াব লাভ করবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁরই সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমুদয় প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"–সে ইসমাইল (আঃ)-এর বংশের ৪ জন গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সওয়াব পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হ'তে মুক্তির দু'আ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, মু'মিন মুসলমান যখন ৩ বার বেহেশত কামনা করে, বেহেশত তখন বলে, হে আল্লাহ ! তুমি তাকে আমার ভিতর প্রবেশ করাও। অতএব তোমারা মুনাজাতে এই প্রার্থনা করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা জান্নাতাল ফিরদাউস।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে জান্নাতুল ফিরদাউস চাই।

আরও যখন সে ৩ বার দোযখ থেকে মুক্তি চায় দোযখ তখন বলে, হে আল্লাহ ! তুমি ওকে আমার ভিতর ঢুকাইওনা।

অতএব তোমরা বলবে, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযাবিন্ নার।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! নরকাগ্নির শাস্তি থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই।

(নাসায়ী, তিরমিযী)

ইব্রাহীম (আঃ) নবীর দু'আ

হাদীস শরীফে এসেছে ইবরাহীম (আঃ) প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় নিম্নলিখিত আয়াত দু'টি পাঠ করতেন। সেই জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'খলীল' উপাধি প্রদান করেছিলেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় উক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করলে দিবা-রাত্রি অযীফা পাঠের সওয়াব পাওয়া যাবে। অর্থাৎ পাঠকারীর আমলনামায় সারাদিন ও সারারাত্রি সওয়াব লিখা হবে। (তফসীর ইবনে কাসীর)

আয়াত দু'টি এই ঃ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ফাসুব্হানাল্লাহি হীনা তুমসূনা ওয়া হীনা তুসবিহূন। ওয়া লাহুল

হামদু ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি ওয়া 'আশীইয়াওঁ ওয়া হীনা তুয্‌হিরূন।

অর্থ ঃ অতএব তোমরা যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও ও প্রত্যুষে উপনীত হও তখন আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। তাঁরই জন্যে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় প্রশংসা তৃতীয় প্রহরে এবং তোমরা যখন দ্বিপ্রহরে উপনীত হও।

(সূরা রুম ১৭ ও ১৮ আয়াত)

সহজতম কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'আ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, দু'টি কালেমা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়, বলতে খুবই সহজ অথচ মিযানের পাল্লায় খুবই ভারী। সে কালেমা দু'টি এই ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী – সুবহানাল্লাহিল 'আযীম।

অর্থ ঃ আল্লাহর জন্য সমস্ত পবিত্রতা ও প্রশংসা, আল্লাহ পবিত্রতাময় মহান।

(বুখারী)

এটা বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি (প্রত্যহ) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ * এই দু'আ পাঠ করবে তার জন্য বেহেশতের ভিতর খেজুর গাছ রোপণ করা হবে। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড ১৮৪ পৃষ্ঠা)

যে তাসবীহ সমস্ত দিনের তসবীহ পাঠের সমতুল্য

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায বাদ এই তাসবীহ ৩ বার পাঠ করবে সে তার সমস্ত দিন তাসবীহ পাঠের সমতুল্য সওয়াব পাবে। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিযা নাফসিহী ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমা-তিহী।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি তাঁর সৃষ্ট জীবের সংখ্যার সমতুল্য এবং তাঁর জাতের সন্তুষ্টির সমতুল্য ও তাঁর আরশের ওজনের তুল্য এবং তাঁর বাক্যাবলীর বিস্তৃতির তুল্য। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

দু'আর শেষ

সকল প্রকার দু'আ পাঠের পর–নিম্নলিখিত দু'আ কয়টি পড়ে মুনাজাত শেষ করবে ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা তাকাব্বাল্ মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল আলীম ওয়া তুব্ 'আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়াবুর্ রাহীম।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু ! আমাদের প্রার্থনা কবূল কর এবং আমাদের তওবা মঞ্জুর কর, তুমি অত্যন্ত তওবা গ্রহণকারী দয়াময়।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া সাল্লাল্লাহু 'আলা খাইরি খাল্ক্বিহী মুহাম্মাদিও ওয়া আ-লিহী ওয়া আসহা-বিহী আজমাইন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন।

অর্থ ঃ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর বংশধরগণ এবং তাঁর সহচরবৃন্দ সকলকে তোমার অনুগ্রহে অনুগৃহীত করো–হে পরম দয়ালু আল্লাহ।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন অথবা ইয়া আরহামার রাহিমীন অথবা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম শব্দগুলি দ্বারা মুনাজাত শেষ করা উচিত।

দু'আ, মুনাজাত ও অযীফার সমূদয় বিষয় কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীস থেকে লিখলে এক বিরাট দফতর হয়ে যাবে। অত্র পুস্তকের কলেবর অতিশয় বৃদ্ধির ভয়ে আমরা দু'আর বিষয় এখানেই শেষ করলাম।

নামায সম্বন্ধে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য

১) কোন ব্যক্তি যখন কোন খোলা জায়গায় নামায পড়বে তখন সে তার সম্মুখে কোন 'ছুতরা' বা লাঠি খুঁটি স্থাপন করবে, কেননা নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করে গেলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

ছুতরাটা আনুমানিক তিন হাতের মধ্যে সম্মুখে স্থাপন করবে। ছুতরার জন্য যদি কোন কিছুই না পাওয়া যায় তবে অন্ততঃ পক্ষে সম্মুখের মাটিতে একটি দাগ দিয়ে নিতে হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

২) কোন ব্যক্তি কদাচ নামাযীর নামাযের সম্মুখ দিয়ে যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার গুনাহের জন্য কিয়ামত দিবসে ভীষণ শাস্তির কথা জানতে পারত, তা হলে ৪০ (বছর) পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রেয় মনে করত, তবুও নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার সাহস করত না বরং সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকত। (বুখারী, মুসলিম)

৩) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যেতে ইচ্ছা করে তবে তাকে বাধা দাও। যদি সে বাধা না মানে তা হলে তার সাথে সংগ্রাম কর। কেননা সে শয়তান। (আবুদাউদ)

৪) মুক্তাদীগণ নামাযের ভিতর রুকু, সিজদা এবং প্রত্যেক ব্যাপারে ইমামের পিছে থাকবে অর্থাৎ ইমামের অনুসরণ করবে– কদাচ কোন কিছু আগে সম্পন্ন করবে না। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে ইমামের আগে রুকু সিজদা হতে মস্তক উত্তোলন করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবস তার মাথা গাধার মাথার ন্যায় করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কোন কোন অদূরদর্শী মৌলবী সাহেব লিখে থাকেন যে, ৪/৫টি অবস্থায় ইমামের আগে মুক্তাদী সালাম ফিরাতে পারে। হায়

আফসোস! ইহা চরম অজ্ঞতার পরিচয় নয় কি ?
(দেখুন বৃহৎ নামায শিক্ষা, কৃতঃ-খুলনা নিবাসী মাওঃ মুয়েজউদ্দিন হামিদী)।

৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, মুসল্লী যেন দু'আ এবং নামাযের ভিতরে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত না করে। কেননা এই অন্যায় কাজের জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার চক্ষু দৃষ্টিহীন করে দিতে পারেন। (মুসলিম)

৬) নামাযের সময় চক্ষুদ্বয় খুলে রাখবে এবং সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখবে। তবে সুন্নাত ও নফল নামাযে মুসল্লী চক্ষু বন্ধ করতে পারে। (বায়হাকী)

৭) ক্ষুধার সময় যদি খাবার সম্মুখে এসে যায় এবং নামাযের ওয়াক্তও উপস্থিত হয় তবে আগে আহার করে নিবে, তারপর নামায পড়বে। (তিরমিযী)

৮) প্রস্রাব-পায়খানার বেগ নিয়ে কখনও নামায পড়বে না।

৯) নামাযের ভিতর কোনও কথা না বলে সাপ ও বিচ্ছু মারা জায়েয।
(আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আহমদ)।

১০) নামাযের ভিতর হাওয়া নিঃস্বরণ সম্বন্ধে সন্দেহ হলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার দুর্গন্ধ না পাওয়া যায় বা শব্দ কর্ণগোচর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নামায ভঙ্গ করবে না। কেননা এইরূপ সন্দেহ শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে। (আবূদাউদ)

১১) আল্লাহর আযাবের ভয়ে নামাযের মধ্যে ক্রন্দন করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের মধ্যে ক্রন্দন করতেন।
(নাসায়ী, আবূ দাউদ, আহমদ, তা'লীকে বুখারী)

১২) নামাযের মধ্যে যদি কারো থুথু ফেলার বিশেষ দরকার হয় তা হলে ডান কিংবা সম্মুখ দিকে ফেলবে না বরং বাম দিকে পায়ের নীচে অথবা রুমালে ফেলবে। (বুখারী)

১৩) স্ত্রীলোকগণ নামায পড়ার সময় স্বীয় চাদর দ্বারা আপাদমস্তক খুব ভাল ভাবে ঢেকে নিবে এবং মাথার চুল খোলা রাখবে না। রাখলে নামায হবে না।
(আবূ দাউদ, তিরমিযী)

১৪) স্ত্রীলোকগণ নামাযের অবস্থায় স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা পদদ্বয়ের টাখনু ঢেকে রাখবে কিন্তু পুরুষ লোক নামাযের মধ্যে টাখনু ঢাকলে তার নামায হবে না, অধিকন্তু তার অযূ নষ্ট হয়ে যাবে। (আবূদাউদ)

১৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন নামাযের মধ্যে কখনও এদিক সেদিক দেখবে না, কারণ উহা শয়তানী কাজ।

(বুখারী ও মুসলিম)

নামাযীর পোষাক পরিচ্ছদ

নামায হচ্ছে আল্লাহর নিকট আত্মনিবেদন করা। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন ঃ

ان احدكم اذا قام فى الصلواة فانما يناجى ربه

অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে অবশ্যই তার প্রভুর সমীপে হৃদয়ের বাসনা জ্ঞাপন ক'রে থাকে।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২য় খণ্ড, ২০পৃষ্ঠা)।

হাদীসে আরও পাওয়া যায় ঃ

الصلواة معراج المؤمنين * উচ্চারণ ঃ আস্সালাতু মি'রাজুল মু'মিনীন।

অর্থ ঃ নামায মু'মিনের জন্য মেরাজ স্বরূপ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং ঊর্ধলোকে গিয়ে আল্লাহর সাথে যেমন গোপন আলাপ অর্থাৎ মেরাজ করেছিলেন তেমনি তাঁর উম্মতগণ দৈনিক পাঁচ বার করে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের, তাঁর নিকট মনের বাসনা কামনা নিবেদন করার এবং উর্দ্ধ লোকের উন্নত চিন্তায় মগ্ন হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। মানুষ সাধারণতঃ কোন সরকারী অফিসার বা রাজকর্মচারীর নিকটে দাঁড়াতে, এমন কি আত্মীয় বা শশুর বাড়ী যেতেও উত্তম পোষাক পরিধান করে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা হলেন জগৎ স্রষ্টা, বিশ্ব সম্রাট, রাজাধিরাজ, অতএব তাঁর বন্দেগী করার সময় অর্থ, সঙ্গতি এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অবহেলা করে খারাপ পোষাক পরিধান করে দাঁড়ান অত্যন্ত অশোভনীয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমিয়েছেনঃ

يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ *

অর্থ ঃ হে আদম সন্তানগণ ; তোমরা প্রত্যেক সিজদার (নামাযের) সময় তোমাদের সুন্দর শোভনীয় পোষাক পরিধান কর, (সূরা 'আরাফ ঃ ৩১ আয়াত)

অতএব আল্লাহর এই হুকুমের অনুসরণ করে নামাযের সময় যতদূর সম্ভব

যথাসাধ্য ভাল পোষাক পরিধান করা উচিত। এ ব্যাপারে অবহেলা করা অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন ঃ

اذا صلى احدكم فليلبس ثوبه فان الله احق من يزين له *

অর্থ ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়বে, তখন সে যেন তার উত্তম কাপড় (পোষাক) পরিধান করে, কারণ আল্লাহ তা'আলাই অধিকতর হকদার যাঁর সম্মানার্থে সুন্দর পোষাক পরিধান করা হবে।" (মাজমাউয্যাওয়ায়েদ ২য় খণ্ড ঃ ৫১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন ঃ "মুসল্লী তার দুই কাঁধ কাপড় দিয়ে না ঢেকে কখনও নামায পড়বে না।

(বুখারী ১ম খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড ১৯৮ পৃষ্ঠা)

পুরুষের নামায পড়ার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে তার লুঙ্গী বা পাজামা যেন টাখনুর নীচে না যায়। গেলে অযূ ও নামায উভয়ই নষ্ট হবে।

(বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, **"আল্লাহ তা'আলা প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের চাদর ছাড়া নামায কবূল করবেন না।"**

(আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ ২১৮ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড ঃ ২৪৪ পৃষ্ঠা ; ইবনে মাজাহ ; ১ম খণ্ড ঃ ৪৮ পৃষ্ঠা ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা ; হাকিম ১ম খণ্ড ঃ ২৫১ পৃষ্ঠা ; বুলুগুল মারাম, ১৭ পৃষ্ঠা)

তবে যার কোন সঙ্গতি নেই এক কাপড়েও নামায পড়া তার জন্য জায়েয।

(বুখারী ১ম খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা)

যার একেবারেই কাপড় নাই এমন কি উলঙ্গ অবস্থায় যার দিন কাটে, তার জন্যও নামায মাফ নাই। তাকে ঐ উলঙ্গ অবস্থাতেই বসে বসে নামায পড়তে হবে। (নসবুর রায়া ১ম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, তাহযীব ১ম খণ্ড ১৫০ পৃষ্ঠা)

খালি মাথায় নামায পড়া অনুচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিকাংশ সময় মাথায় টুপি অথবা পাগড়ী কিংবা টুপির উপর পাগড়ী পরে নামায পড়তেন। কেউ কেউ খালি মাথায় নামায পড়াকে মাকরূহে তাহরিমী বলে থাকেন, এটা ঠিক নয়। ওযর ও অসুবিধা বশতঃ খালি মাথায় নামায পড়া যেতে পারে, সুফী ও ফকীহদের মধ্যেও কেউ কেউ অধিকতর নম্রতা ও আযেযী ইনকিসারীর জন্য খালি মাথায় নামায পড়া অবৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

সাহু সিজদার বিবরণ

মানুষ ভুল ত্রুটি শূন্য নয়। নামাযের মধ্যেও মুসল্লীর হঠাৎ ভুল হয়ে থাকে। যখন ভুল ত্রুটি ঘটে যায় তখন সংশোধনের জন্য দু'টি সিজদা করতে হয়। এই সিজদাকে সাহু সিজদা বলে। নামাযে ভুল বশতঃ কোন রুকন বা ওয়াজিব বাদ পড়লে অথবা তা বেশী করা হলে শেষ বসায় আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ, দু'আয়ে মাসূরা ইত্যাদি পড়ার পর সালাম ফিরাবার পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলে অন্যান্য সিজদার ন্যায় দু'টি সিজদা করতে হবে এবং সিজদা করার পর কোন কিছু না পড়েই সালাম ফিরাবে। (বুখারী, মুসলিম)

সাহু সিজদা দেওয়ার পর তাশাহ্হুদ পড়ার নির্দেশ কোন সহীহ হাদীসে নেই। (বায়হাক্বী)

জামা'আতে নামায পড়া অবস্থায় মুক্তাদী যদি কোন ভুল করে বসে তবে সেই ভুলে সাহু সিজদা নেই। (তিরমিযী)

নামাযে তাশাহ্হুদ পড়তে বসার সময় একক মুসল্লী যদি হঠাৎ ভুলবশতঃ পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যায় তবে সাহু সিজদা দিতে হবে, সামান্য একটু উঠলে দিতে হবে না। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী)

সাহু সিজদার ঐ সমস্ত দু'আ পাঠ করতে হবে যা অন্যান্য সিজদায় পাঠ করা হয়। যদি রাকা'আতের সংখ্যার মধ্যে সন্দেহ হয় তবে দুই সংখ্যার মধ্যে কম সংখ্যা ধরে নিয়ে নামায পূর্ণ করে তাশাহ্হুদ, দরূদ ইত্যাদি পাঠ শেষ করে দু'টি সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। (মুসলিম)

নামায শেষ করার পর কেউ নামাযের ভুল ত্রুটি স্মরণ করিয়ে দিলে কোন কথাবার্তা বলার আগে শুধু সাহু সিজদা করলেই সেরে যাবে, নতুন করে সম্পূর্ণ নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না। (সিহাহ সিত্তা)

জামাতের নামাযে ইমামের ভুল হলে মুক্তাদীগণ سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) বলে ইমামকে স্মরণ করিয়ে দিবে। (বুখারী, মুসলিম)

নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত পাঠ

সারা কুরআনে ১৫টি সিজদার আয়াত আছে। ঐ সমস্ত আয়াত নামাযের

কিরাআতে পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহু আকবার বলে একটি সিজদা করতে হবে। সিজদা করার পর আবার দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট কিরাআত শেষ করে যথারীতি রুকু, সিজদাহ ইত্যাদি আদায় করে নামায সম্পন্ন করতে হবে। (বুখারী)

তিলাওয়াতে সিজদার নিম্নলিখিত দু'আ সমূহের যে কোন একটি পাঠ করতে হবে।

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَّاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ *

উচ্চারণ : "আল্লাহুম্মাকতুব লী বিহা ইনদাকা আজরান ওয়াজি' 'আন্নী বিহা বিযরান ওয়াজআলহা লী ইনদাকা যুখরান ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নী কামা তাকাব্বালতাহা মিন 'আবদিকা দাউদ।"

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমার জন্য এই সিজদার বিনিময়ে তোমার নিকট পুরস্কার লিপিবদ্ধ কর। এই সিজদার কারণে আমার পাপকে বিদূরিত কর। এই সিজদাকে আমার জন্য তোমার নিকট নেকীর স্তূপাকারে পরিণত কর। তোমার বান্দা দাউদের সিজদা যেমন কবূল করেছিলে, তেমনি আমার এই সিজদা কবূল কর। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ *

উচ্চারণ : সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সওওয়ারাহু ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওওয়াতিহ।

অর্থ : আমার মুখমণ্ডল সেই মহা প্রভুর জন্য সিজদা প্রদান করছে যিনি ওকে (চেহারাকে) নিজের কৌশল এবং শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং সূরত দান করে চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা সুশোভিত করেছেন। (আবূদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ *

উচ্চারণ : "সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররূহ।"

অর্থ : হে আমাদের এবং ফিরিশতা ও জিব্রাঈলের প্রভু ! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশস্তি, সমস্ত পবিত্রতা। (মুসলিম)

তিলাওয়াতে সিজদার আয়াতসমূহ

নামাযের ভিতর হউক অথবা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময় হোক সিজদার আয়াত পাঠ করলে উক্ত পাঠকারীকে এবং যারা শুনবে তাদের সবাইকে তৎক্ষণাৎ একটি সিজদা করতে হবে। এটা সুন্নত, কোন কোন মতে ওয়াজিব। কুরআন মাজীদের যে পনের জায়গায় সিজদার আয়াত আছে তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

ক্রঃ নং	পারা	সূরা	রুকু	আয়াত	যে শব্দের পর সিজদা
১।	৯	আ'রাফ	২৪	২০৬	يسجدون শব্দের পর
২।	১৩	রা'আদ	২	১৫	اصال শব্দের পর
৩।	১৪	নহল	৬	৫০	يومرون শব্দের পর
৪।	১৫	বনী ইসরাইল	১২	১০৯	خشوعا শব্দের পর
৫।	১৬	মারইয়াম	৪	৫৮	بكيا শব্দের পর
৬।	১৭	হাজ্জ	৪	১৮	يشاء শব্দের পর
৭।	১৭	হাজ্জ	১০	৭৭	تفلحون শব্দের পর
৮।	১৯	ফুরক্বান	৫	৬০	نفورا শব্দের পর
৯।	১৯	নমল	২	২৬	العظيم শব্দের পর
১০।	২১	(সাজদা)	২	১৫	لا يستكبرون শব্দের পর
১১।	২৩	(সদ)	২	২৪/২৫	اناب/ماب শব্দের পর
১২।	২৪	হা-মীম সাজদা	৫	৩৮	لا يسئمون শব্দের পর
১৩।	২৭	(নজম)	৬	৬২	واعبدوا শব্দের পর
১৪।	৩০	(ইযাস সামাউন শাক্কাত)	১	২১	لا يسجدون শব্দের পর
১৫।	৩০	('আলাক)	১	১৯	واسجد واقترب শব্দের পর

নামাযের মধ্যে কতিপয় আয়াতের জওয়াব

নিম্নলিখিত আয়াতগুলি যেখানেই পঠিত হবে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে তার জওয়াব স্বরূপ যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বলতে হবে। (সিহাহ্ সিত্তা)

জামা'আতের নামাযের ইমাম জোরে কিরায়াত পড়লে কিংবা একক নামাযী

উক্ত কিরায়াতে উক্ত আয়াত পাঠ করলে নামাযের অবস্থাতেই শোনার সাথে সাথেই তার জওয়াব দিতে হ'বে। নামাযের বাইরে পঠিত হলেও শুনলে জওয়াব বলতে হ'বে। (সুনানে আরবাআ)

১। সূরা আররহমানে– فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

জবাব لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (ترمذي)

২। সূরা আল মুরসালাতে فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

জবাব آمَنَّا بِاللّٰهِ (ابو داود-ترمذی)

৩। সূরা আল কিয়ামাতে أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

জবাব بَلَىٰ (ابوداود-ترمذی)

৪। সূরা ওয়াত্তীনে– أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

জবাব بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (ابو داود- ترمذی)

৫। সূরা আ'লাতে– سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ

জবাব سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ

تفسير فتح البيان، احمد، ابوداؤد، طبرانى، بيهقي)

৬। সূরা জুমু'আতে– وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *

জবাব اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا رِزْقاً حَسَناً

৭। সূরা মুলকে– فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ *

জবাব اللّٰهُ يَأْتِينَا وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ *

(تفسير موضح القران)

৮। সূরা গাশীয়ার শেষে— ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

জবাব (تفسير ابن كثير) اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَّسِيْرًا

৯। সূরা বাকারা শেষে— فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

জবাব (تفسير الاتقان) آمِيْنْ

মাসবূকের নামায

যে ব্যক্তি ইমামের ফরয নামায কিছু পড়ার পর জামা'আতে যোগ দেয় তাকে মাসবূক বলে। মাসবুককে রুকু, সিজদা, দাঁড়ান কিংবা বসা যে অবস্থাতেই হউক জামা'আতে শামিল হতে হবে। সে ইমামের সঙ্গে নামায পড়তে থাকবে। জামা'আতে পূর্ণ নামায না পেলে ইমামের সঙ্গে সালাম না ফিরিয়ে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়ে বসে থাকবে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট নামায একা পড়ে নিবে। ইমামের সঙ্গে সে যে কয় রাকাত পড়েছে সেটা তার নামাযের প্রথমাংশে ধরে নিয়ে অবশিষ্ট নামায শেষ করবে। (আউনুল মা'বুদ)

মাসবূকের ইমামত

মাসবূক ইমামত করতে পারে, এর প্রমাণ হচ্ছে এই যে, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুখ অবস্থায় আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) নামাযে ইমামত করছিলেন। কিছু নামায আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে আগমন করলেন, তিনি আবূ বকরের পাশে বসে নামাযের ইমামত করলেন। আবূ বকর এবং অন্যান্য সকল সাহাবা মুক্তাদী হয়ে নামায সম্পন্ন করলেন। (বুখারী, মুসলিম)

এই হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এক মাসবূক অন্য মাসবূকের কিংবা নূতন মুসল্লীর ইমাম হ'তে পারে।

(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ফাতাওয়া নাযিরীয়াহ)

তবে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক মাসবূকের পিছনে অন্য মাসবূক, তার পিছনে অপর মাসবূক এবং সেই মাসবুকের পিছনে আবার অন্য মাসবূকের ইকতিদা করা অনুচিত। কেননা তাতে এমন এক সিলসিলা জারি হয়ে যায় যাতে করে জামা'আতের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। সুতরাং যে প্রথমে ইমামের সঙ্গে

নামায পায়নি তার পক্ষে মাত্র একজন মাসবূকের পিছনেই এক্তেদা করা চলতে পারে। কিন্তু তারও পরে যারা নামায পড়তে আসবে তাদের পক্ষে নূতন জামা'আত শুরু করে নামায পড়াই বাঞ্ছনীয় এবং ইহাই উত্তম।

ইমামের সঙ্গে যে ব্যক্তি রুকুতে মিলিত হয় সে রাকাত পেল কি না ?

কোন ব্যক্তি জামা'আতের নামাযে ইমামের সাথে রুকুতে শামিল হ'লে সে উক্ত রাকাত পেল কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। আবু দাউদ, মুয়াত্তা মালেক, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মাহ প্রমুখের মতে রুকু পেলেই রাকা'আত পাওয়া গেল। কিন্তু যেহেতু উক্ত রাকাতে কিয়াম কিরায়াত অর্থাৎ দাঁড়ানো এবং সুরা ফাতিহা পাঠ করা হয়নি এবং সুরা ফাতেহা ছাড়া কোন নামাযই হয় না সেই হেতু আয়েম্মায়ে মুহাদ্দিসীনের এক জামা'আত উক্ত রাকাত দোহরায়ে পড়ার পক্ষপাতী।

আমার মতেও কিয়াম করা ও সুরা ফাতিহা পাঠের তাকীদের হাদীস সমূহ বিচার করলে দোহরায়ে পড়াই কর্তব্য।

সিজদায়ে শুক্‌র

যখন কারো কোন আনন্দের ব্যাপার উপস্থিত হয় অথবা কেউ কোন খুশীর সংবাদ পায় কিম্বা কেউ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে তখন সিজদায়ে শুক্‌র করা সুন্নাত। (আহমদ, আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

সিজদায়ে শুক্‌রের জন্য আল্লাহ্ আকবার বলে একটি সিজদা দিবে এবং আল্লাহ্ আকব্বার বলে সিজদা থেকে উঠে ডান দিকে একটা সালাম দিবে।

সিজদায়ে শুক্‌রে থাকবে দুই তাক্‌বীর, এক সিজদা এবং এক সালাম মাত্র।

জামা'আতের নামাযে ইমামের ভুল হ'লে

জামাতে পঠিত নামাযে ইমামের কিরায়াতে ভুল হলে মুক্তাদীগণ তার লোকমা দিবে অর্থাৎ ভুল সংশোধন করে দিবে। (আবূদাউদ, তালখিসুল হাবীর)

পুরুষদের জামাতে ইমামের রুকু, সিজদা, কওমা, জালসা রাকা'আত ইত্যাদিতে ভুল হ'লে পুরুষ মুক্তাদী سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) বলে ইমামকে

সতর্ক করে দিবে। কিন্তু মেয়েদের জামাতে ইমামের ভুল হ'লে মেয়ে মুসল্লীরা এক হাত দ্বারা অপর হাতে তালি দিয়ে (দস্তক মেরে) শব্দ করে জানিয়ে দিবে। (বুখারী, মুসলিম)

ইমামের একা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমামত করা নাজায়েয

মুক্তাদীদের ছাড়া শুধু ইমামের একা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ানো নাজায়েয। (আবূ দাউদ, হাকিম, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা, নায়লুল আওতার)।

অবশ্য সমান জায়গার যদি একান্তই অভাব হয়, তবে ইমাম নিরুপায় অবস্থায় ডাইনে-বামে কমপক্ষে দুইজন মুসল্লী দাঁড় করিয়ে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমামত করতে পারেন। দুই পার্শ্বে দুইজন দাঁড়াবারও যদি স্থান না হয় তবে অগত্যা ডান পার্শ্বে এক জন মুসুল্লী দাঁড় করিয়ে ইমাম উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে পারেন।

মসজিদের স্তম্ভ বা খামকে কাতারের মাঝে রেখে কাতার করা নিষেধ

মসজিদের ভিতরে যে স্তম্ভ, খাম বা পিলার থাকে সে জায়গা বরাবর কাতার করে খামের ডাইনে বামে লোক দাঁড়িয়ে খামের জায়গা বাদ দিয়ে কাতার করে নামায পড়া নাজায়েয। ঐভাবে পড়লে নামায হবে না, বরং খামের সম্মুখ বা পিছন দিকে কাতার করা কর্তব্য। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও আহমদ)

কাতারের পিছে একা দাঁড়ান

জামা'আতের নামাযে কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এক ব্যক্তি ভুল বশতঃ পড়তেছিলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় নামায পড়ার হুকুম করেছিলেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুক্রবার ছাড়া অন্যান্য দিনে সূর্য উঠা, সূর্য ডুবা এবং দ্বিপ্রহরের সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকলেও শুক্রবার দিন জুমু'আর সুন্নাত পড়া জায়েয বলেছেন। (মুসলিম)

ফজরের সুন্নাত বাদে ডান কাতে শোয়া

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত নামায পড়ার পর ফরযের আগে ডান কাতে একটু শুতেন এবং স্বীয় উম্মতকে এইভাবে শুতে নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ)

এই শোয়া অবস্থায় নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করা যেতে পারে:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَّمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا - اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا وَّفِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا وَّفِيْ دَمِيْ نُوْرًا وَّفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ نُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ نُوْرًا - اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا اَبْوَابَ رِزْقِكَ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ 'আল ফী ক্বালবী নূরাওঁ ওয়া ফী বাছারী নূরাওঁ ওয়া ফী সাময়ী নূরাওঁ ওয়া আঁয় য়ামীনী নূরাও ওয়া আন্ শিমালী নূরাওঁ ওয়া মিন খালফী নূরাও ওমিন আমামি নূরাওঁ ওয়ায 'আল মিন্ ফাউকী নূরাওঁ ওয়া মিন্ তাহতী নূরান। আল্লাহুম্মা-আ'তিনী নূরাওঁ ওয়াজ 'আল লী নূরাওঁ ওয়া ফী 'আসাবী নূরাওঁ ওয়া ফী লাহমী নূরাওঁ ওয়া মিন দামী নূরাওঁ ওয়া ফী শা'আরী নূরাওঁ ওয়া ফী বাশারী নূরাওঁ ওয়া ফী লিসানী নূরাওঁ ওয়াজ'আল ফী নাফসী নূরাওঁ ওয়া 'আযিম নূরাওঁ ওয়াজ'আলনী নূরা, আল্লাহুম্মাফতাহ লানা আবওয়াবা রহমাতিকা ওয়া সহ্হিল লানা আব্ওয়াবা রিয্ক্বিকা।

মর্মার্থঃ আল্লাহ্ আমাকে নূর দাও, আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে, চক্ষুতে, কর্ণে, ডাইনে, বামে, পশ্চাতে, সামনে, উর্ধে, নিম্নে নূর দাও, আমার জন্য নূর দাও,

অঙ্গে, অস্থিতে, মাংসে, রক্তে, চুলে, চর্মে, জিহ্বায় নূর দিয়ে উদ্ভাসিত কর, আমার সত্তায় নূর দাও, মহৎ কর নূরকে আমার জন্য, আমাকেই নূরে পরিণত করে দাও, তোমার রহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্য উন্মুক্ত করে দাও, তোমার দেয়া রুযী রিযক্বের দরোজা আমার জন্য সহজ করে দাও।

ফজরের ফরয আগে পড়লে সুন্নত পরে পড়া

কেউ যদি দেখে ফজরের জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেছে তবে সে তৎক্ষণাৎ জামাতে শামিল হবে এবং ফরয পড়ার পর– সুন্নত আদায় করবে। **বেলা উঠার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।** (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ

অর্ধ রাত্রি অর্থাৎ রাত একটার পর থেকে নিয়ে ফজরের নামাযের পূর্ব সময় পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত। তাহাজ্জুদ নামায আট রাকাত চার সালাতে পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকাত বেতের সহ সব সময় এগার রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য বিশেষ কোন সূরা পাঠ করার কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। যার জন্য যা সহজসাধ্য সে সেই সব সূরা দিয়েই নামায আদায় করবে। তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠে নিম্নলিখিত দু'আ সমূহ দশবার পাঠ করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহি; আল্লাহু আকবর ; সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম : সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ যীকিদ্ দুনইয়া ওয়া যীকি ইয়াওমিল কিয়ামাহ। (বুখারী, মুসলিম)

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ - اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

উচ্চারণঃ ইন্না ফী খালকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান্নাহা-রি লাআ-ইয়াতিল্-লি- উলীল আলবা-ব ; আল্লাযীনা ইয়াযকুরূনাল্লাহা কিয়ামাওঁ ওয়া কু'উদাওঁ ওয়া 'আলা জুনূবিহিম ওয়া ইয়াতাফাক্কারূনা ফী খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি রাব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান, সুবহা-নাকা ফাকিনা 'আযাবান্ নার।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের ভিতরে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বিদ্যমান–যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং পার্শ্বে ভর করে–শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে (এবং বলে)ঃ প্রভু হে! তোমার সৃষ্টি কোনটাই বৃথা নয়, সুতরাং আমাদেরকে অগ্নির (দোযখের) শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো তাহাজ্জুদের নামায। (মুসলিম)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও ফরমিয়েছেন, তোমরা তাহাজ্জুদ নামায অবশ্য পড়বে, যেহেতু তা নবীদের এবং পূর্ববর্তী নেককার লোকদের অভ্যাস ও আদত। এই নৈশ নামাযে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব হয় এবং গুনাহ থেকে এই নামায উক্ত নামাযীকে বিরত রাখে, অধিকন্তু এতে পাপরাশী ক্ষমা হয় এবং শারীরিক রোগ-ব্যাধী দূরীভূত হয়। (তিরমিযী, হাকিম)

হাদীস শরীফে আরও এসেছে, দিবসের নামায অপেক্ষা নৈশ নামাযের ফযীলত এরূপ বেশী যেমন প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপন দানের ফযীলত বেশী। (অর্থাৎ সত্তর গুণ বেশী)। (তাবারানী, আত-তারগীব ওয়াত্তারহীব)

আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি ফরমিয়েছেন, তোমরা কদাচ নৈশ নামায (তাহাজ্জুদ) ছাড়বে না, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) কখনও ঐ নামায ছাড়েননি, এমনকি তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও বসে বসে উক্ত নামায আদায় করতেন, কখনও উহা পরিত্যাগ করতেন না। (আবূ দাউদ, হাকেম-তালখিসুল মুস্তাদরাক)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন মাজীদের দশ আয়াত তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনও গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। যে ব্যক্তি একশত আয়াত পাঠ করবে তাকে আল্লাহ নেহায়েত ফরমাঁবরদার (অনুগত) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত পাঠ করবে তাকে আল্লাহ বেহিসাব সওয়াব হাসিলকারীদের দফতরে শামিল করে দিবেন। (আবূদাউদ)

রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও ফরমিয়েছেন, তোমরা তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অভ্যাস করার পর পুনরায় তা ছেড়ে দিও না, যেহেতু উক্ত নামাযের অভ্যাস পরিত্যাগ করা অত্যন্ত হতভাগ্যের কাজ, এরূপ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই পুরুষের প্রতি অত্যন্ত রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন যে পুরুষ নিজে তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড়ে এবং স্বীয় স্ত্রীকে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য ঘুম থেকে জাগায়। আর স্ত্রী যদি না জাগে, তবে তার চোখে পানি ছিটা দিয়ে হলেও জাগিয়ে দেয়। আর ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি আল্লাহর অজস্র রহমত বর্ষিত হয়, যে নিজে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে এবং স্বীয় স্বামীকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে জাগায়। এমনকি না জাগলে চোখে পানির ছিটা দিয়ে হলেও জাগায়। (আবূদাউদ, নাসায়ী)

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নেকীর কাজের জন্য কিছুটা জোর জবরদস্তী করাও জায়েয আছে।

বিতর নামাযের বিবরণ

বিতর নামায নয় রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। (মুসলিম)

সাত রাকা'আতেরও প্রমাণ আছে। (মুসলিম)

পাঁচ রাকাত পড়ারও দলীল এসেছে। (বুখারী, মুসলিম)

তিন রাকাত বিতর পড়ারও হাদীস আছে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে এক রাকা'আত

বিতর পড়তেন এবং উম্মতকেও এক রাকাত বিতর পড়তে নির্দেশ দিয়াছেন।

(বুখারী,মুসলিম,আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তাবারানী)

বিতর নামাযের শেষ রাকাতে রুকুর পর দাঁড়িয়ে মুনাজাতের মত করে দুই হাত তুলে সর্বোত্তম দু'আয়ে কুনূত পাঠ করবে, হাদীসের কিতাবে তিন প্রকার দু'আয়ে কুনূত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম দু'আ ঃ

اللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ ٭

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা ওয়া 'আফিনী ফিমান 'আফায়তা ওয়া তাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লায়তা ওয়া বারিক লী ফীমা আ'তায়তা ওয়া ক্বিনী শাররা মা কাযায়তা ফাইন্নাকা তাক্‌যী ওয়ালা ইউকযা 'আলায়কা ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মাও ওয়ালায়তা ওয়ালা ইয়া'যিযু মান্ আদায়তা, তাবারাক্‌তা রাব্বানা ওয়া তা'আলায়তা ওয়া সাল্লাল্লাহু 'আলান্ নাবী।

অর্থঃ প্রভু হে! যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছ আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি ক্ষমা করেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত কর। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ আমাকে তাদের পর্যায়ভুক্ত কর। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি আমার তাকদীরে যা লিখেছ তার ভিতরকার অমঙ্গল হতে আমাকে রক্ষা কর; কেননা তুমি ভাগ্য নির্দ্ধারণকারী। তোমার উপর কারো হুকুম চলে না, তুমি যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর সে কোন দিন অপমানিত হবে না এবং যার সঙ্গে শত্রুতা কর সে কোন দিন সম্মানিত হবে না। প্রভু হে! তুমি বরকতময় এবং সর্বোচ্চ। নবীর উপর দরুদ নাযিল কর।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ٭

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিযাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমু'আফাতিকা মিন 'উকূবাতিকা ওয়া আ'উযুবিকা মিনকা লা উহ্সী সানাআন আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা 'আলা নাফসিকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার ক্রোধ হতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এবং তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার আযাব হতে রক্ষা চাই এবং তোমার কাছেই তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার প্রশংসা পরিমাপ করতে অক্ষম। তুমি নিজে নিজের যেমন প্রশংসা করেছ–তুমি তাই-ই।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী.)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ الْجِدَّ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতা'ঈনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা ওয়া নুসনী 'আলাইকাল খাইরা, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলা'উ ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস'আ ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা 'আযাবাকাল জিদ্দা ইন্না 'আযাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহেকুন।

(তিরমিযী, বায়হাকী, গায়াতুল আওতার, ফেকহুস সুনানে ওয়াল আসার, ইবনে আবী শাইবাহ)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই আমরা তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি ও তোমারই উপর 'তাওয়াক্কাল' করছি। আমরা তোমারই মঙ্গল গান করছি ও তোমারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তোমার অকৃতজ্ঞ নাই আমরা। যারা তোমার অবাধ্য, আমরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ও তাদেরকে আমরা দূরে রেখেছি ও দূরে থাকছি, হে আল্লাহ ! আমরা তোমারই ইবাদত করছি, তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ছি, তোমাকেই সিজদা

করছি, তোমারই ইবাদতের জন্য চেষ্টা করছি ও তোমারই সেবা করছি। আমরা তোমারই করুণার আকাঙ্ক্ষী এবং তোমার 'আযাবকে আমরা অতিশয় ভয় করি, নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদেরকে ঘেরাও করে ফেলবেই।

বিতর নামাযে নিয়মিতভাবে সব সময় দু'আয়ে কুনূত পড়ার তাকিদ নাই।

বিত্‌র পর দুই রাকা'আত নফল নামায

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, তোমরা বিত্‌র পর দুই রাকা'আত নামায পড়তে পার। (দারমী, দারাকুতনী, তাহাবী)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত দুই রাকাত নামায বসে বসে পড়তেন এবং প্রথম রাকা'আতে সূরা 'ইযা যুলযিলাত' ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা 'কাফিরূন' পাঠ করতেন। (আহমদ, তাহাবী)

বিশেষ অবস্থায় নামায দীর্ঘ ও খাট করা

দীর্ঘকরণ ঃ

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নামায দীর্ঘ করা জায়েয ; যথা–শান্তি ও নিরাপত্তার সময় এবং জামা'আত ছোট হলে ও জামা'আতে কোন মা'যূর লোক নাই জানা থাকলে এবং একাকী নামায পড়তে নামায দীর্ঘ করা যায়। (আবূদাউদ)

সংক্ষেপ করণ ঃ

শত্রু ও দুশমনের ভয় থাকলে নামায সংক্ষেপ করা যায়, যেমন যুবায়ের (রাঃ) তাঁর ফাসীর সময় নামায সংক্ষেপ করে পড়েছিলেন। (বুখারী)

মুসল্লীর ছেলে মেয়ে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছে এমতাবস্থায় নামাযে একাগ্রতার ত্রুটি হওয়ার আশংকায়-নামায খাট করে পড়া যেতে পারে। হাদীসে

تخفيف الصلوٰة بيكا ، الصبيان*

'শিশুদের ক্রন্দনে নামায সংক্ষেপ করনের অনুমতি আছে। রাসূলে মাকবূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, আমি জামা'আতের নামায শিশুর ক্রন্দন শুনে খাট করি যাতে তার মা বাবা নামাযের মধ্যে অমনোযোগী না হয়। (তিরমিযী)

নামায সংক্ষেপ করা অর্থে কেরাআত ছোট করা, তাই বলে রুকু সেজদার তসবীহ্ কমপক্ষে ৩ বারের কম পড়লে চলবে না। (আবূ দাউদ)

ফজরে দু'আয়ে কুনূত পড়ার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝে মাঝে ফজরের ফরয নামাযে দ্বিতীয় রাকা'আতে রুকুর পর দুই হাত তুলে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতেন। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা)

বিপদ আপদ কালে নামাযে খাস দু'আয় কুনূত পড়া

কোন ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলিম সমাজ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে কিংবা কোন সামগ্রিক ও ব্যাপক বিপদ আসলে নিম্নলিখিত দু'আয়ে কুনূত নামাযের মধ্যে শেষ রাকা'আতে রুকুর পর মুনাজাতের মত হাত তুলে পাঠ করা সুন্নত।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَاْسَكَ الَّذِىْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ *

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি, ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত, ওয়া আল্লিফ বাইনা কুলূবিহিম ওয়াসলিহ্ যাতা বাইনিহিম ওয়ানসুরহুম 'আলা 'আদুব্বিকা ওয়া আদুব্বিহিম। আল্লাহুম্মাল'আনিল কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াসুদ্দূনা আন সাবীলিকা ওয়া ইউকায্যিবূনা রুসুলাকা ওয়া ইউক্বাতিলূনা আওলিয়াআকা। আল্লাহুম্মা খালিফ বাইনা কালিমাতিহিম ওয়া যালযিল্ আকদামাহুম, ওয়া আনযিল বিহিম বা'সাকাল্লাযী লা তারুদ্দুহু 'আনিল ক্বাউমিল মুজরিমীন।

অর্থ : হে আল্লাহ ! মু'মিন মুসলমান নর-নারীগণকে ক্ষমা কর, তাদের

পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি দান কর এবং পরস্পরের প্রতি তাদের মনকে বিশুদ্ধ কর এবং ওদের ও তোমার শত্রুদের উপর ওদেরকে শক্তি দান কর। হে আল্লাহ ! ঐসব বিধর্মীদের প্রতি অভিসম্পাত কর– যারা তোমার সরল পথে বাধা সৃষ্টি করছে, তোমার পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলছে এবং তোমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। হে আল্লাহ ! তাদের কথার বিরুদ্ধাচরণ কর ও তাদেরকে পদস্খলিত কর এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ, বিবাদ অবতীর্ণ কর, যাতে পাপাত্মাগণ যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে কেউই ফিরে যেতে না পারে।

(কাশফুল মুগাত্তা ফী শারহিল মুয়াত্ত', বায়হাকী, ইবনে আবী শায়বাহ)

হানাফী জামা'আতের লোক দু'আয়ে কুনূত পাঠ করার পূর্বে তাকবীর তাহরীমার ন্যায়, "আল্লাহু আকবার" বলে দুই হাত তুলে আবার হাত বেঁধে কুনূত পাঠ করে থাকেন, কিন্তু দুই ঈদের নামায ও জানাযার নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায আদায়কালে অতিরিক্ত তাকবীর বলা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন প্রকার নির্দেশ বা নযীর নাই। অতএব তাকবীর বলে দুই হাত বেঁধে কুনূত পাঠ করা হযরতের আদর্শের অনুকূল নয়। (কিয়ামুল লাইল)

মুনাযাতে যে ভাবে দু'আ করা হয় তেমনি দু'আয় কনূতও পড়তে হবে। **তবে দু'আয়ে কুনূত রুকুর আগে এবং পরে পড়া দুই অবস্থার কথাই হাদীসে পাওয়া যায়।** (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

জুমু'আর নামায

জুমুআর নামায প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষের জন্য ফরয। নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা জুমআর নামায ফরয প্রতিপন্ন হয়েছে ঃ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *

অর্থঃ ওহে বিশ্বাসীগণ ! জুমু'আর দিন যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য দৌড়ে যাও এবং কেনা-বেচা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য মঙ্গল জনক, যদি তোমরা জ্ঞানী হও।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি জুমু'আর নামায ফরয নয় ঃ

যথা ঃ (১) কৃতদাস। (২) মেয়েলোক। (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে (৪) রোগী ও (৫) মোসাফির। (আবূ দাঊদ, হাকিম)

মসজিদে মেহরাব দেওয়া

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তাঁর মসজিদে মেহরাব ছিল না। (মাজমু'আ ফাতাওয়া, ফতহুল বারী, যবুলকুলুব, সিফরুসসা'আদাত)

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদের মধ্যস্থলে মিম্বর ছিল এবং উক্ত মিম্বর ও কিবলার পার্শ্বের দেওয়ালের মাঝে এক হাত ফাঁক ছিল। (তাসহিলুল কারী শরহে সহীহ্ বুখারী, ২য় খণ্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা)

মসজিদে নববীতে ২য় শতাব্দীতে উহার পুনর্নির্মাণকালে উমর বিন আবদুল আযীয মেহরাব সংযোজন করেন। (সুয়ুতী কৃত কিতাবুল ওয়াছেল)

কুরআন মাজীদে মারইয়াম (আঃ)-এর যে মেহরাবের উল্লেখ আছে তা প্রচলিত মেহরাব ছিল না, বরং সেটা মসজিদে সর্বদা অবস্থানের জন্য একটা আলাদা কুঠরী ছিল। যেমন, আমরা ইমাম বা মুয়াযযিনের থাকার জন্য মসজিদ সংলগ্ন তৈরী করে থাকি।

সুতরাং কুরআন মাজীদে বর্ণিত মেহরাব অর্থ দিবা-রাত্রি অবস্থানের কোঠা বিশেষ! প্রচলিত মেহরাব নয়।

(তফসীরে ফতহুল বয়ান, জামে'উল বয়ান, জালালায়েন, ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর ইত্যাদি এবং মওলানা আশরাফ আলী থানবী কৃত তরজুমায়ে কুরআন মজীদ)

আল্লামা ছাদুল্লাহ কান্দাহারী (হানাফী) মেহরাব সম্পর্কিত আয়াতের টীকায় লিখেছেন,

"মসজিদে কিবলার দিকে দেওয়ালের ভিতর খোলদার তাকয়াতে ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়িয়ে থাকেন এবং ইদানীং যা' মেহরাব নামে পরিচিত তা'হচ্ছে নবাবিষ্কৃত। ফোকাহাগণ উক্ত তাককে মেহরাব নামে অভিহিত করেছেন। যে প্রচলিত মেহরাব এ যাবৎ মসজিদ সমূহে চলে আসছে তা ওয়ালিদের খেলাফত যুগে উমর বিন্ আবদুল আযীয তৈরী করেছিলেন।

(কাশফুল মাহযুবাইন মরগুবুল কুলুব-মওলানা আবদুল হক দেহলভী কৃত)

আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত ঃ মেহরাবের ভিতরে গিয়ে ইমামের নামায পড়ান মাক্রূহ।

(বায্যার, মিরক্বাত তফসীর ফতহুল বয়ান, মজমু'আ ফাতাওয়া ১ম খন্ড; ১৪৯ পৃষ্ঠা)

ফলকথা মসজিদে মেহ্রাব না দেওয়াই সুন্নতের অনুকূল, তবে ইমামের আগে দাঁড়ান ব্যাপারে মসজিদে একটি কাতারের জায়গা নষ্ট হয় বিধায় জরুরাতান সামান্য একটু বাড়ান-যাতে ইমাম এগিয়ে দাঁড়াতে পারেন এবং মেহরাবও বড় না হয়, এইরূপ মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে ইমাম মেহরাবের ভিতরে দাঁড়াবেনা বরং মসজিদের মূল দেওয়ালের ভিতরে দাঁড়াবে এবং মেহরাবে শুধু সিজদা দিতে পারবে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে সমাজে ফেৎনা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

জুমু'আর নামাযে আযান

রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় এবং প্রথম দুই খলীফা আবূবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর যুগে জুমু'আর নামাযে খুতবার সময় মসজিদের দ্বার দেশে একই আযান দেওয়া হত। কিন্তু তৃতীয় খলীফা 'উসমান (রাঃ) লোকের সুবিধার জন্য মসজিদে নববী হতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে জাওরা নামক বাজারে দ্বিতীয় আযানের প্রচলন করেন। (বুখারী, ফতহুল বারী)

তদবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত কোথাও দুই এবং কোথাও এক আযান প্রচলিত রয়েছে।

তবে এখনও কোন স্থানে দুই আযানের প্রয়োজন অনুভূত হলে (অর্থাৎ শুক্রবারে হাট বাজার ও কল কারখানায় লোক ব্যস্ত থাকলে) 'উসমানের সুন্নাত মুতাবিক মসজিদ থেকে বেশ কিছু দূরে আযান দেওয়া যেতে পারে। আমার মতে, এক আযান দেওয়াই উত্তম। **তবে এ নিয়ে কোন ঝগড়া ফাসাদ এবং জামা'আতে অনৈক্য সৃষ্টি কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নয়। কোন কোন মৌলবী সাহেব প্রধান আযানকে বিদ'আত বলেন এটা জ্ঞানের সংকীর্ণতার পরিচায়ক। কোন কোন লোক আবার দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভিতর মিম্বরের নিকটে ইমামের কাছে দিয়ে থাকেন, এই ভাবে আযান দেওয়ার কোন প্রমাণ হাদীসে নেই। বরং মসজিদের দরওয়াজার বাইরে দ্বিতীয় আযান দিতে হবে।** (আউনুল মা'বূদ)

মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দু'আ

মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিয়ে এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

বিসমিল্লাহি ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে, অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি সালাম, হে আল্লাহ ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে এই দু'আ পাঠ করবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাযলিকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুকম্পা প্রার্থনা করি।

(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

তাহ্ইয়াতুল মসজিদ (মসজিদে প্রবেশ করে) নামায

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে সঙ্গে সঙ্গে দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায দখুলে মসজিদ (তাহ্ইয়াতুল মসজিদ) আদায় করবে, তারপর প্রয়োজন হলে বসবে। দুই রাকা'আত না পড়ে কখনও বসবে না। (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক)

এমন কি ইমাম খুতবা দিচ্ছেন এমন অবস্থাতেও কোন মুছল্লী মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে উক্ত দুই রাকা'আত নামায অবশ্য পড়তে হবে। একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দানকালে জনৈক সাহাবা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলে 'তাহ্ইয়াতুল মসজিদ' দুই রাকা'আত নামায না পড়ে বসাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে খুতবার ভিতরেই উক্ত দুই রাকা'আত পড়ে তার পর বসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তি দুই রাকা'আত নামায পড়ে বসেছিল। (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

কোন কোন লোক মসজিদে প্রবেশ করেই আগে বসে, তারপর নামায পড়ে। এই বসা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের সম্পূর্ণ বরখেলাপ। অতএব এ অভ্যাস পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। ফিকাহ্ গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে, মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে সর্ব প্রথম তাহ্ইয়াতুল মসজিদ নামায পড়বে। (দুররে মুখতার ৪র্থ খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠা, আলমগীর ৪র্থ খণ্ড ২২৭ পৃষ্ঠা, ফিকহুস সুন্নানে ওয়াল আসার)

জামা'আতে ও মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার নিজ ঘরে নামায পড়ে, তার সেই এক নামাযেরই সওয়াব হয়। গ্রামের বা মহল্লার মসজিদে পড়লে পঁচিশ গুণ, জামে' মসজিদে পড়লে পাঁচশত গুণ, বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে পড়লে পঞ্চাশ হাজার গুণ, আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে পড়লে) পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং মক্কা মুকার্‌রামার মসজিদে- (মসজিদুল হারামে পড়লে) এক লক্ষ গুণ সওয়াব হয়। (ইবনে মাজাহ্)

জুমু'আর দিন সর্ব প্রথম মসজিদে প্রবেশকারীর ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, জুমু'আর দিন মসজিদে প্রবেশকারীদের সওয়াব লিখার জন্য ফেরেশতা মসজিদের দরওয়াজায় বসে থাকেন। যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মসজিদে প্রবেশ করে তার জন্য ফেরেশতা মক্কা মুকাররামায় হজ্জের মওসুমে একটি উট কুরবানী দেয়ার সমতুল্য সওয়াব লিখেন। তারপর যে ব্যক্তি প্রবেশ করে একটি গরু কুরবানীর, তারপর একটি বকরী কুরবানীর, তারপর একটি মুরগির, তারপর একটি ডিম খয়রাতের সমতুল্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে নিম্নস্তরের সওয়াব লিখতে থাকেন। অতঃপর যখন ইমাম খুৎবা দিতে দাঁড়িয়ে যান তখন ফেরেশতাগণ তাদের দফতর বন্ধ করে ইমামের খুতবা শুনতে থাকেন, কাজেই সেই সময় যে আসবে তাঁর জন্য উপরোক্ত সওয়াবে কোনই ভাগ নাই। (বুখারী, মুসলিম)

ঈদের দিন জুমু'আর নামায

ঈদ এবং জুমু'আ এক দিনে হলে কেউ কেউ শুধু ঈদের নামায পড়ে

জুমু'আর নামায ছেড়ে দেওয়ার ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এটা ঠিক নয়। যদিও এই মর্মে একটি হাদীস আছে, কিন্তু উক্ত হাদীসটি দুর্বল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন জুমু'আর নামায ফরয আর ঈদের নামায সুন্নাত। অতএব সুন্নাতের জন্য ফরয তরক করা জায়েয হ'বে না। সুতরাং সহীহ্ হাদীস মুতাবিক আগে ঈদ এবং পরে জুমু'আ দু'টাই পড়া বাঞ্ছনীয় এবং উত্তম।

(মুসলিম, নাসায়ী, আয়যাজীরুশ শাদীদ ৮২ পৃষ্ঠা)

এ বিষয়ে একটি সহীহ্ হাদীস আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন,

قد اجتمع فى يومكم هذا عبدين فمن شاء اجزاه من الجمعة وان مجمعون

অর্থ ঃ আজকের দিনে তোমাদের দু'টি খুশী (ঈদ) একত্রিত হয়েছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে জুমুআকে ছেড়ে দিতে পারে, তবে আমি দুটোকেই জমা করি (অর্থাৎ ঈদও করি, জুমু'আও পড়ি), (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকিম, বায়হাকী)

এই হাদীস অনুসারে ঈদের দিনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আ পড়া সাব্যস্ত হচ্ছে এবং রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত সকল মুসলমানের জন্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। অতএব ঈদের দিনে জুমু'আর নামায পড়া বাঞ্ছনীয় এবং বেহতর বা উত্তম।

তবে হ্যাঁ, দূরবর্তী এলাকার মসজিদের মুসল্লীদের জন্য ঈদের নামায আদায়ের পর বাড়ী গিয়ে জুমু'আ পড়ার সময় থাকবে না– এরূপ হলে তারা জুমু'আ না পড়ে যোহর পড়তে পারে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম শাফিঈর এই মত।

জুমু'আর ফরযের পূর্বে সুন্নত নামায

খুৎবার পূর্বেই (দুই, চার, ছয়, আট, দ'শ) যত ইচ্ছা ও যতটা সম্ভব সুন্নাত পড়া যেতে পারে, এর কোন সীমা নির্দেশ নেই। (বুখারী, মুসলিম)

যুহরের সুন্নাতের উপর কেয়াস করে মাত্র চার রাকা'আত সুন্নত পড়ার কোন প্রামাণ্য দলীল নেই।

জুমু'আর খুৎবা

ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রথমে মুসল্লীদেরকে সালাম দিবেন, (ইবনে মাজাহ্, ইবনে আবী শায়বাহ্)।

খুৎবা দেওয়ার সময় হাতে লাঠি লওয়া সুন্নত। (আবূদাউদ)

দুই খুৎবার মাঝখানে ইমাম বসবেন কিন্তু কোন কথা বলবেন না, (আবূ দাউদ)।

খুৎবার ভিতরে ইমামের অযথা হাত নাড়ান এবং লম্ফ ঝম্ফ করা নিষেধ, (মুসলিম)।

ইমাম যখন খুৎবা প্রদান করেন তখন চার জানু হয়ে বসা নিষেধ। (মুসলিম)

খুৎবার ভিতর প্রয়োজনে ইমাম সাহেব মুসল্লীদের সঙ্গে দরকারী কথা বলতে পরেন। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর সূরা 'কাফ' এর প্রথমাংশ এবং দ্বিতীয় খুৎবায় অবশিষ্টাংশ পড়তেন এবং মুসল্লীদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি শুনাতেন। (মুসলিম)

খুৎবা খাট করে নামায দীর্ঘ করা সুন্নাত এবং এটা ইমামের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। (মুসলিম)

জুমু'আর নামাযে পঠিতব্য সূরা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আর নামাযে সূরা ফাতিহার পর কোন কোন সময় প্রথম রাকা'আতে 'কাফ' দ্বিতীয় রাকা'আতে 'সূরা দাহর' পাঠ করতেন। অনেক সময় প্রথম রাকা'আতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে 'গাশীয়াহ' পাঠ করতেন। আবার কোন কোন সময় প্রথম রাকা'আতে সূরা 'জুমু'আ' এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা মুনাফিকূন পড়তেন। (মুসলিম)

জুমু'আর খুৎবায় বিভিন্ন ভাষায় ওয়াজ নসীহত করা

কুরআন হাদীস মুতাবিক খুৎবার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করা এবং কালিমায়ে

শাহাদাত ইত্যাদি পাঠ করা ও মুসল্লীগণের ভাষায় তাদেরকে প্রয়োজনীয় ওয়াজ নসীহত করা জায়িয। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

অর্থ ঃ আমি প্রত্যেক রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দেশবাসীর ভাষা সহকারে পাঠিয়েছি যাতে তাদেরকে ভালভাবে বুঝাতে পারেন। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪ আয়াত)

কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا

অর্থ ঃ তিনি পাক পবিত্র যিনি তার খাস বান্দাহর (রাসূলের) প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন যাতে করে তিনি সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে ভয় প্রদর্শন করতে পারেন। (সূরা ফুরকান, ১ আয়াত)

যেহেতু কুরআন বিশ্বগ্রন্থ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ্ব রাসূল, কাজেই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের জন্য কুরআন ও হাদীসের উপদেশ বিভিন্ন ভাষায় বুঝিয়ে দেয়া একান্ত কর্তব্য ও কাম্য। এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীসটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় ঃ

عن جابر ابن سمرة قال كانت للنبى صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القران ويذكر الناس رواه مسلم

অর্থ ঃ জাবের ইবনে সামুরাহ হতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (জুমু'আর দিনে) দু'টি খুৎবা দিতেন এবং তার মাঝে বসতেন–তিনি খুৎবায় কুরআন মাজীদ পাঠ করতেন এবং মানুষকে ওয়াজ করতেন। (মুসলিম)

তিনি নিজ ভাষায় ওয়াজ করতেন। কাজেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে খতীবরাও আপন আপন ভাষায় ওয়াজ করবেন।

ইমাম শাফেয়ী প্রত্যেক ইমামকে জুমু'আর খুৎবায় আপন আপন ভাষায় ওয়াজ করাকে ওয়াজিব বলেছেন। (তানকিহের রূওয়াত–শরহে মিশকাত, ১ম খণ্ড ২৬৪ পৃঃ)

হানাফী ফতোয়ার কিতাব সিরাজিয়ায় এবং মওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (হানাফী) সাহেবের কিতাব মাজমু'আ ফাতাওয়া ১ম খণ্ডে ২৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত রয়েছে যে, শ্রোতাদেরকে তাদের ভাষায় খুৎবা বুঝিয়ে দেওয়া জায়িয।

জুমু'আর পর সুন্নাত

জুমু'আর ফরযের পর ৪ রাকা'আত সুন্নাত পড়া কর্তব্য। (মুসলিম)

ছয় রাকা'আত পড়া চলে কিন্তু কমপক্ষে দুই রাকা'আত অবশ্য পড়তে হবে।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, আসারুস্‌সুনান, তাহাবী)

আখেরী যোহর

কোন কোন লোক গ্রামস্থ মসজিদে জুমু'আর ফরয আদায়ের পর পুনরায় সন্দেহস্থলে যোহরের পরিবর্তে 'এহ্‌তীয়াতুয যোহর' বা 'আখেরী যোহর' নামে ৪ রাকা'আত নামায পড়ে থাকে। এটা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ নিয়তে নামায পড়া নাজায়িয। ফিকার কিতাবে আছে এহ্‌তিয়াতী যোহর পড়া উচিত নয়।

(দুররে মুখতার ঃ ১ম খণ্ড ৩৬৭ পৃঃ, আউনুল মা'বূদ)

জুমু'আর নামায তরককারীর অবস্থা

মুসাফির ব্যক্তির জন্য অসুবিধা হলে জুমু'আর নামায ছেড়ে দিয়ে যোহর পড়া জায়েয। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জুমু'আর নামায পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার অন্তঃকরণে সীলমোহর করে দেন এবং তাকে গাফিল করে ফেলেন। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমু'আর নামায ছেড়ে দেয় তার কাফ্‌ফারা স্বরূপ এক দিনার আর অক্ষম হলে আধা দিনার সাদকা করতে হবে। (আহমদ, আবূদাউদ, ইবনে মাজাহ্)

এক নামায দু'বার পড়া

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, কোন ব্যক্তি একা কোন ফরয নামায পড়লে এবং পরে আবার জামা'আত পেলে সে পুনরায়

জামা'আতের সঙ্গে ঐ নামায পড়তে পারে, কিংবা প্রথমে মুক্তাদী হয়ে পড়ার পর আবার ঐ নামায ইমাম হয়ে পড়তে পারে। তার প্রথম নামায ফরয এবং দ্বিতীয় নামায নফল হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, বায়হাকী, মুয়াত্তা মালেক)

কাযা ও ভুলের নামায

ভুলে কিংবা নিদ্রায় থাকাবস্থায় নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে যখন স্মরণ হবে বা ঘুম থেকে জাগবে তখনই নামায আদায় করবে।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ)

তিন বা ততোধিক লোকের নামায একত্রে কাযা হলে আযান ও ইকামত দিয়ে জামাতের সঙ্গে ফরয আদায় করবে। অথবা শুধু ইকামত দিয়ে আদায় করতে পারে। (বুখারী)

চার ওয়াক্তের নামায কাযা হলে তারতীব মত তা পর পর আদায় করা আবশ্যক হবে না। ওয়াক্তের নামায আদায় করার পূর্বে কাযা নামায আদায় করবে। চার সংখ্যার কম ওয়াক্ত কাযা হলে একসঙ্গে একে একে সব নামায আদায় করে তারপর উপস্থিত ওয়াক্তের নামায আদায় করবে।

(তিরমিযী, ১ম খণ্ড ২৫ পৃষ্ঠা)

কিন্তু কাযা নামাযী কাযা আদায়ের পূর্বে উপস্থিত জামা'আত হচ্ছে দেখতে পেলে জামা'আতের সাথে শামিল হবে এবং জামা'আত শেষে কাযা নামায আদায় করবে।

তারাবীর নামায

তারাবীর নামায সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযান মাসে ইশার নামাযের পর ৮ রাকা'আত তারাবী নামায পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম)

রামাযান কিংবা অন্য মাস সব সময়েই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতর সহ ১১ রাকা'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ পড়তেন। এর বেশী পড়তেন না। (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযানের ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখে জামা'আতের সাথে মহিলাদের সহ তারাবীর নামায পড়িয়েছেন।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

উমর (রাঃ) জামা'আত করে বিতরসহ এগার রাকা'আত তারাবীহ নামায আদায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (মুয়াত্তা মালেক)

ওযর বশতঃ কেউ জামা'আতে যোগদান করতে না পারলে একাকীই পড়বে, কখনও পরিত্যাগ করা উচিত হবে না। যেহেতু এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। তারাবীহ নামায স্ত্রীলোকেরাও পড়বে এবং তারা পুরুষের জামা'আতেও শামিল হতে পারে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

রামাযান ছাড়া অন্য মাসে যাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়–রামাযান মাসে তাকেই তারাবীহ বলে। (ফতহুল ক্বাদীর, ফয়যুল বারী, বাহরুর রায়েক)

তারাবীর পর মুতলক নফল নামাযের নীয়্যাত করে যত ইচ্ছা পড়া যেতে পারে। তবে কোন কোন আলেমের মতে রামাযানে ইশার পর তারাবীহ এবং তারপর গভীর রাত্রে তাহাজ্জুদও পড়া জায়েয।

তারাবীহ নামায সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য

তারাবীহ অর্থ স্বস্তিলাভ বা বিশ্রাম গ্রহণ করা।

(লোগাতে মুগরব, কামূছুল মুহীত, মাজমাউল বিহার)

অতএব কিরায়াত, রুকু ও সিজদা দীর্ঘ করে ৪ রাকাতের পর বসে কিছু সময় বিশ্রাম করবে। (বুলূগুল আমানী, সুনানে কুবরা)

তারাবীর নামাযের জন্য কোন নির্দিষ্ট সূরা বা দু'আর কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ তারাবীহ নামাযকে ফরযের মত মনে করে থাকেন এবং কোন অবস্থাতেই উক্ত জামা'আত পরিত্যাগ করা চলবে না বলে ধরে নেন। এটা অতিরঞ্জন, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারা রামাযানে মাত্র ৩ দিন জামা'আতের সাথে আট রাকাত তারাবীহ পড়েছিলেন এবং ফরয হওয়ার ভয়ে অবশিষ্ট দিনগুলোতে উক্ত নামায যার যার বাড়ীতে নিজ নিজ গৃহে পড়তে বলেছেন। (বুখারী, (৪) ৬৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম (১) ২৬৬ পৃষ্ঠা, আহমদ (৫) ১৩ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, বায়হাকী (২) ৪২ পৃষ্ঠা এবং কিয়ামুল লাইল ৯৫ পৃষ্ঠা)

এতে প্রমাণ হয় যে, বর্তমানে তা ফরয নয় এবং পূর্বেও ফরয ছিল না। অতএব, ওযর অসুবিধা বশতঃ বিশেষ অবস্থায় তা তরক করা যেতে পারে। তবে রামাযানে প্রত্যেক নেক কাজের পুণ্য যখন ৭০ গুণ পাবার আশা আছে তখন এই

মুবারাক মাসে উক্ত নামায ছাড়া উচিত হবে না। হাদীসে এসেছে-

من قام رمضان ايمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রামাযানের রজনীগুলিতে ঈমানের সাথে নেকীর আশায় (তারাবীহ) নামায পড়বে তার পূর্বের পাপরাশি ক্ষমা করা হবে। (সিহাহ সিত্তা)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও ফরমিয়েছেন, তারাবীহর জামা'আতে যে ব্যক্তি তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইমামের ইকতিদা করতে থাকবে সে সমস্ত রাত্রি জেগে নামায পড়ার সওয়াব লাভ করবে।

(মুসনাদে আহমদ (৫) ১১ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ (১) ৫২১ পৃষ্ঠা, তিরমিযী (২) ৭২ পৃষ্ঠা, নাসায়ী ২৬৮ পৃষ্ঠা, বায়হাকী (২) ৪৯৪ পৃষ্ঠা এবং কিয়ামুল লাইল ৮৯ পৃষ্ঠা)

কোন কোন লোক তারাবীর নামায মোটেই পড়ে না, এমন কি তারা জামা'আত করে তারাবীর নামায পড়াকে বিদ'আত বলে থাকে এটা অত্যন্ত অন্যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং অন্ততঃ তিন দিন জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়েছেন এবং জামা'আতের সাথে তা পড়তে উৎসাহিত করেছেন। অধিকন্তু ফরয হওয়ার ভয়ে অবশিষ্ট দিনগুলোতে বাড়ীতে পড়তে বলেছেন এবং পড়তে নিষেধ করেন নাই। **উম্মতের প্রতি সুন্নাত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনে যে কোন কাজ মাত্র একবার করার প্রমাণই যথেষ্ট।** সাহাবায়ি কিরামদের সকলেই তারাবীর নামায জামা'আতের সাথে পড়তেন। কাজেই তারাবীর জামা'আত কায়েম করা নিঃসন্দেহে সুন্নাত। (আবূ দাউদ, সুনানে কোবরা)

কাজেই এই প্রামাণ্য সুন্নাত কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করা উচিত হবে না।

মেয়েদের পক্ষে তারাবীর জামা'আত কায়িম করা জায়েয। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্বর্ণ যুগে সাহাবাদের বিবিদের জন্য তারাবীর 'নারী জামা'আত' কায়িম করার মৌন সম্মতি দান করেছেন।

(মুসনাদে আহমদ, বুলুগুল আমানী, কিয়ামুল লাইল)

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) এবং উম্মে সালমা (রাঃ) মেয়েদের ফরয নামাযে এবং তারাবীর জামা'আতে ইমামতী করতেন। (দারকুতনী, বায়হাকী, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, আউনুল মা'বুদ, তালখীসুল হাবীর)

তারাবীর নামাযের রাকা'আত সংখ্যা

তারাবীহ নামাযের রাকা'আত সংখ্যা সম্বন্ধে নানা প্রকার উক্তি শোনা যায়। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৩ (তিন) রাকা'আত বিতর সহ ১১ (এগার) রাকা'আতের অধিক তারাবীহ্ পড়তেন না।

(বুখারী, ১ম খণ্ড ১৫৩ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা)

অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যা আমল, তাই তাঁর উম্মতগণের মনে-প্রাণে গ্রহণ করা উচিত।

হানাফী ভাইগণ ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়ে থাকেন। তারা উমর (রাঃ) বিশ রাকা'আত পড়েছেন বলে একটি হাদীস পেশ করে থাকেন। উক্ত হাদীসটি জঈফ ও অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সম্পর্কে বহু বিদ্বান ও হাদীস বিশারদগণের উক্তি এবং সিদ্ধান্তের কথা আমরা প্রমাণপঞ্জীসহ বর্ণনা করবো।

(১) বুখারীর ভাষ্যকার হাফেজুল হাদীস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, উক্ত বিশ রাকা'আতের হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল, অধিকন্তু তা বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক পঠিত এগার রাকা'আত সম্পর্কীয় বিশুদ্ধ হাদীসের প্রতিকুল। (ফতহুল বারী (৩) ১৮১ পৃষ্ঠা)

(২) আল্লামা ইবনুল হুমাম (হানাফী) লিখেছেন, বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়ার হাদীসটি দুর্বল, অধিকন্তু তা বুখারীর হাদীসের বিরুদ্ধ।

(ফতহুল কাদীর শরহে হেদায়া (১) ২০৫ পৃষ্ঠা)।

(৩) আল্লামা যয়ল'য়ী (হানাফী) বলেছেন, বিশ রাকা'আত তারাবীহ্ পড়ার হাদীসটি জ'ঈফ হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ নাই। অধিকন্তু এ হাদীসটি জননী 'আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণিত ১১ রাকা'আতওয়ালা বিশুদ্ধ হাদীসের প্রতিকুল। (নসবুর রায়া (১) ২৯৩ পৃষ্ঠা)

(৪) আল্লামা আইনী হানাফী বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বিশ রাকা'আত ওয়ালা হাদীসের সনদের মধ্যে আবূ শায়বা রয়েছেন। একে ইমাম শু'বা মিথ্যুক বলেছেন এবং ইমাম আহমদ, ইবনে মু'ঈন, ইমাম বুখারী ও নাসায়ী প্রমুখাৎ সকলে যঈফ বলেছেন। ইবনে আদী স্বীয় 'কামিল' গ্রন্থে এই

হাদীসটি আবূ শায়বার প্রত্যাখ্যাত হাদীস সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।
(উমদাতুল কারী (২) ৩৫৮ ও ৩৫৯পৃষ্ঠা)

(৫) হাফিয যহবী বলেছেন, বিশ রাকা'আত ওয়ালা হাদীসের সনদে আবূ শায়বা মিথ্যাবাদী। কাজেই উক্ত হাদীস জঈফ। (খুলাসা, ২০ পৃষ্ঠা)

(৬) ভারত-বিখ্যাত আলেম মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (হানাফী) তিরমিযীর ভাষ্য গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

اما النبي صلى الله عليه وسلم فصح عنه ثمان ركعات واما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق *

অর্থ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুধু আট রাকা'আত তারাবীহ বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বিশ রাকা'আত তারাবীহ সম্বন্ধে যে রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে তার সূত্র দূর্বল এবং তার দুর্বলতা সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম একমত। (আরফুশ্ শাযী, ৩০৯ পৃঃ)

তিনি আরও বলেন,

لا مناص من تسليم ان تراويحه عليه السلام كان ثمانية ركعات *

অর্থ ঃ এটা স্বীকার না করে গত্যন্তর নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তারাবীহ ছিল আট রাকাত। (আরফুশ শাযী, ৩০৯পৃঃ)

৭) হাফিয ছফীউদ্দীন তদ্বীয় রিজাল গন্থে লিখেছেন, বিশ রাকা'আত তারাবীহওয়ালা হাদীসের রাবী আবূ শায়বাকে ইবনে মুঈন ও আবূ দাউদ জ'ঈফ বলেছেন এবং নাসায়ী তার হাদীস বর্জনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।
(তাকরীবুত্ তাহযীব, ১৪ পৃঃ)

৮) ইমাম দারমী ইবনে মুঈনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, আবূ শায়বা বিশ্বস্ত নন। ইমাম আহমদ বলেন, তিনি জঈফ। ইমাম বুখারী বলেন, তাঁর সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মৌনতাবলম্বন করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর হাদীস পরিত্যাজ্য। (মিযানুল ই'তিদাল (১) ২১ পৃষ্ঠা)

৯) ইবনে ছা'আদ বলেছেন, আবূ শায়বা দুর্বল, দারকুতনীও এ কথা বলেছেন। ইমাম আহমদ তাকে হাদীস শাস্ত্রে অগ্রাহ্য বলে মন্তব্য করেছেন।
[তাহযীবুত্ তাহযীব (১) ১৪৪ পৃষ্ঠা]

১০) ইমাম বুখারী বলেন, আবূ শায়বাকে বিদ্বানগণ গ্রহণ করেননি।

(কিতাবুয যু'আফা, ২ পৃষ্ঠা)

১১) ইমাম নাসায়ী বলেন, আবূ শায়বার হাদীস বর্জনীয়।

(কিতাবুয যু'আফা, ২ পৃষ্ঠা)

১২) আল্লামা শাইখ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (হানাফী) বলেন যে, ইরাকী স্বীয় আলফিয়ার টীকায় লিখেছেন, যার সম্বন্ধে ইমাম বুখারী বলে থাকেন فيه نظر তার বিষয়ে আপত্তি আছে। অথবা سكتوا عنه বিদ্বানগণ তার সম্বন্ধে মৌনতাবলম্বন করেছেন, তাকে বর্জনীয় বুঝতে হবে। (আররফউ ওয়াততাকমীল ঃ ২০ পৃষ্ঠা)

(১৩) আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আলকুরায়শী (রহঃ) 'তারাবীহ' সম্বন্ধে বহু প্রমাণাদিসহ একটি বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাতে তারাবীহ নামায যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিতরসহ ১১ এগার রাকা'আত তা বহু হাদীস দিয়ে প্রমাণ করেছেন। তিনি অকাট্য দলীল দিয়ে সপ্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়া আদৌ প্রমাণিত নয় এবং এ সম্পর্কে যে হাদীস উপস্থিত করা হয়ে থাকে তা বাতিল।* (তারাবীহ ৮৬ পৃষ্ঠা)

ইশরাকের নামায

ইশরাকের অর্থ ঘরের দরওয়াজা দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করা।

(আল মুনজেদ, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

** রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তারাবীহ আট রাকা'আত ছিল। যারা আরবী পড়তে পারেন না তারা বাংলায় অনুবাদকৃত নিম্নোক্ত হাদীসগ্রন্থাবলী দেখে নিন।*

১। বুখারী শরীফ ঃ অনুবাদক ঃ মাওলানা আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬০৮, সহীহ্ আল বুখারী ঃ (প্রকাশক ঃ আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড হাদীস নং ১০৫৮, ১০৭৬ দ্বিতীয় খণ্ড হাদীস নং ১৮৭০। বুখারী (প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩য় খণ্ড হাদীস নং ১৮৮১।

২। সহীহ্ মুসলিম ঃ ৩য় খণ্ড হাদীস নং ১৫৮৭, ১৫৮৮, ১৫৯০, ১৫৯২, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৬, ১৫৯৭।

৩। মেশকাত ঃ (প্রকাশক ঃ এমদাদীয়া লাইব্রেরী) অনুবাদকঃ নূর মোহাম্মদ আযমী ৩য় খণ্ড হাদীস নং ১২২১, ১২২৭, ১২২৮, ১২২৯। মেশকাত (মাদ্রাসা পাঠ্য) দ্বিতীয় খণ্ড হাদীস নং ১২২১, ১২২৮, ১২২৯।

যখন সূর্যের আলো প্রকাশ পায় তখন যে নামায পড়া হয়, তাকেই ইশরাকের নামায বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, ফজরের নামায আদায় করার পর জায়নামাযে বসে দু'আ দরূদ পাঠ করতে থাকবে এবং ঐ অবস্থায় বেলা উঠার পর ২,৪,৬ অথবা ৮ রাকা'আত পর্যন্ত ইশরাকের নামায পড়া জায়েয। এই নামায যে ব্যক্তি পড়বে তার সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের মত পাপও মাফ হয়ে যায়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

যুহা বা চাশতের নামায

الضحى حين تشرق الشمس

যুহা অর্থ যখন সূর্যের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় (আল্ মুনজেদ, ৪৬২ পৃঃ) ঐ সময় যে নামায পড়া হয় তাকে সালাতুয্ যুহা বা চাশতের নামায বলা হয়।

সূর্যের উত্তাপ যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ বেলা অনুমান ৮/৯টা থেকে নিয়ে বেলা দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত যুহা বা চাশতের নামায পড়া যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ২ থেকে ৮ রাকা'আত পর্যন্ত চাশতের নামায আদায় করতেন।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইব্নে মাজাহ্, আহমদ, মালেক ও ইবনে হিব্বান)

চাশতের নামাযের জন্য বিশেষ সূরা বা দু'আর কথা হাদীসে নাই। কাজেই যিনি যে সূরা দ্বারা পারেন তাই দিয়ে উক্ত নামায আদায় করবেন। **তবে একটি জঈফ হাদীসে আছে**– সালাতুয যুহা দুই রাকাত পড়লে কিরায়াতে সূরা ওয়াশ্ শামছ এবং সূরা যুহা পড়বে। (জামে সাগীর)

এই নামাযের অত্যধিক ফযীলতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, মানুষের শরীরে ৩৬০ টি জোড়া আছে ; যে ব্যক্তি চাশতের নামায (صلوة الضحى) আদায় করবে তার এই জোড়াগুলোর সাদকা আদায় হবে। (আবূ দাউদ, ইব্নে খুজায়মাহ্, ইব্নে হিব্বান, আহমদ)

কোন কোন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি দুই রাকা'আত চাশতের নামায পড়বে তাকে আল্লাহ ইবাদত বন্দেগীতে গাফেল করবেন না। যে ব্যক্তি চার রাকা'আত পড়বে 'আবিদের দফতরে তার নাম লিখা হবে। যে ব্যক্তি ছয় রাকা'আত পড়বে তার

সমস্ত দিনের ইবাদতের পুণ্য হবে, যে ব্যক্তি আট রাকা'আত পড়বে তার নাম ক্বানিতীনের (অতিশয় অনুগত বান্দাদের) দফতরে লিখানো হবে, যে ব্যক্তি বার রাকা'আত পড়বে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্‌তে ঘর বানাবেন।

(তাবারানী, তারগীবুত তারহিব)

কসর নামাযের বিবরণ

قصر কসর অর্থঃ খাট, দীর্ঘের প্রতিকূল। (আলমুনজিদ)

কোন সৎ উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয়ে দূর দেশে গেলে বিদেশে যে নামায পড়া হয় তার সংক্ষেপকরণকে কসর বলা হয়। কসর নামায সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اذا خرجتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوٰة

অর্থঃ যখন তোমরা যমীনে (বিদেশে) ভ্রমণ কর তখন তোমাদের নামাযের মধ্যে কম করাতে ক্ষতি নাই। (সুরা নিসা ঃ ১০১ আয়াত)

বিদেশে বের হলে যোহর, আসর ও ইশার ফরয নামায চার রাকাতের স্থলে দুই রাকা'আত পড়াকে উক্ত নামাযের কসর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, "কসর আল্লাহর দান; অতএব তা কবূল কর"। (মুসলিম)

ফজর ও মাগরিবে কসর নাই। (আহমদ)

কত দিন বিদেশে থাকলে কসর পড়তে হবে সে সম্পর্কে হাদীসে পাওয়া যায় যে,

عن ابن عباس رضى الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا واذا زدنا اتممنا (البخارى)

অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উনিশ দিন পর্য্যন্ত সফরে থাকলে কসর পড়তেন; আমরাও যখন উনিশ দিন সফরে থাকতাম তখন কসর পড়তাম ; এর বেশী থাকলে পূর্ণ নামায পড়তাম, [বুখারী, ১ম খণ্ড ঃ ১৪৭ পৃষ্ঠা]

কেউ কেউ ৩ দিনের কম বিদেশে থাকলে তাকে সফর বলতে চান না এবং তাতে কসর পড়ার প্রয়োজনীয়তাও মনে করেন না। এটা ঠিক নয়, কারণ

বলেছেন, سمي النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক রাত্র বিদেশে থাকাকেই সফর বলতেন (এবং তাতে কসর পড়তেন)। (বুখারী, ১ম খণ্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা)

কত মাইল দূরের ভ্রমণের জন্য নামায কসর করা জায়িয, এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার হাদীস পাওয়া যায়। আমাদের বর্তমান হিসাবে তা নিম্নপক্ষে ৯ (নয়) মাইল এবং উর্ধে ৪৮ (আটচল্লিশ) মাইল। (সিহাহ্ সিত্তা)

ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস ৪ বুরূদের মধ্যে কসর পড়তেন অর্থাৎ ১৬ ফরসক, [বুখারী ১ম খণ্ডঃ ১৪৮ পৃষ্ঠা]। ৩ মাইলে এক ফরসক এবং ৪ ফরসকে এক বুরূদ। সুতরাং ৪ বুরূদে ৩ × ৪× ৪=৪৮ মাইল।

সফরের নীয়্যাতে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পরই যে নামাযের ওয়াক্ত আসবে তখন সেই নামায থেকেই কসর পড়তে শুরু করবে।

عن انس بن مالك قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين *

অর্থঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি ফরমিয়েছেন, আমি নবীজীর সাথে মদীনায় যোহরের নামায ৪ (চার) রাকা'আত এবং যুলহুলায়ফাতে আসরের নামায ২ (দুই) রাকা'আত পড়েছি। (বুখারী, ১মখণ্ড ঃ১৪৮ পৃষ্ঠা)

যুলহুলায়ফা মদীনা থেকে অল্প দূর। এই হাদীসের মর্ম হলো যে, বাড়ী থেকে অল্প দূরে যাওয়ার পরই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কসর পড়লেন।

ইমাম আবূ হানিফাও (রহঃ) ৪ বুরূদে কসর পড়ার মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম নাওয়াবী লিখেছেন– ইমাম শাফী, মালেক, লায়েছ ও ইমাম আওযায়ী এবং আহলে হাদীস ফকীহ ও বিদ্বানদের নিকটে দুই মানযিলের কম রাস্তায় কসর পড়া জায়িয নয়। দুই মানযিলে হয় হাশেমী ৪৮ মাইল।

(নওয়াবী শরহে মুসলিম, ১ম খণ্ড)

ইমাম শওকানী লিখেছেন, সফরের উদ্দেশ্য ছাড়া বহু দূর রাস্তায় গেলেও কসর পড়া জায়েয হবে না এবং সফরের উদ্দেশ্যে ১২ মাইল গেলেও কসর পড়া জায়িয হবে। (আদদুরারেল মুযীয়াহ ঃ ৬৯পৃষ্ঠা)

শাইখুল হাদীস আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী লিখেছেন,

والراجح عندي ما ذهب اليه ائمة الثلاثة انها يقصر الصلاة في اقل من ثمانية واربعين ميلا بالهاشمي *

অর্থঃ আমার নিকট বলিষ্ঠ মত হচ্ছে সেটাই যে দিকে ইমামত্রয় গিয়েছেন অর্থাৎঃ কমপক্ষে হাশেমী ৪৮ মাইলের মধ্যে কসর নামায পড়া যাবে, আর তা হচ্ছে ইংরেজী ৫২ মাইল। (আল মিরআতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড ঃ ২৫৬ পৃষ্ঠ)

ইমাম বুখারী (রহঃ) কসর নামায সম্বন্ধে নিম্নরূপ অধ্যায় রচনা করেছেন ঃ

باب يقصر الصلوة اذا خرج من موضعه

অর্থঃ "আপন জায়গা থেকে বাহির হওয়ার পর কসর পড়ার অধ্যায়" অতপর তিনি নিম্নলিখিত হাদীসে বর্ণনা করেছেন,

خرج علي ابن ابي طالب فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها ۔

অর্থঃ আলী (রাঃ) বাড়ী থেকে বের হয়ে বাড়ী দেখা যায় এমতাবস্থায় কসর পড়লেন; তার পর বাড়ী ফিরার পথে যখন তাকে বলা হলো এটা কুফা শহর, তখন তিনি বললেন হোক না কেন তা, বাড়ীতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কসর পড়বো।

(বুখারী,১ম খণ্ড ঃ ২৪০ পৃষ্ঠা)

কসরের দূরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

কতদুর রাস্তা অতিক্রম করলে কসর পড়তে হবে এ সম্বন্ধে বিদ্বানদের মধ্যে বহু মতানৈক্য দেখা যায় এবং বিভিন্ন প্রকার রিওয়ায়াত পাওয়া যায়– ৬। ৯। ১২। ১৬। ২২। ৪৮। ৫২। ৬৪। মাইল পর্যন্ত উল্লেখ আছে।

তবে বর্তমানে এই যান্ত্রিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষের দিনে অত্যাধুনিক ও দ্রুতগামী যানবাহনের যুগে এই ধরনের অল্প-রাস্তায় কসর পড়া বাঞ্ছনীয় কি না তা মুহাক্কিক আলিমগণের বিবেচনার যোগ্য। কারণ বর্তমান যুগে দূরতিগম্য রাস্তাও মানুষের নিকট সহজগম্য হয়ে উঠেছে। এক দিন এমন ছিল যে, মানুষ শুধু পায়ে হেঁটে সমস্ত পথ অতিক্রম করতো। আজিকার মত সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট ছিল না, বিভিন্ন ধরনের যান-বাহন ছিলনা। দেশ-দেশান্তরে যেতে বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত পাড়ি দিয়ে তাদেরকে চলতে হতো। তাই ১০। ১২ মাইল পথ অতিক্রম করতেও তাদের লেগে যেত অনেক সময়; আর আজকাল ঘন্টায় শত সহস্র মাইল রাস্তাও অনায়াসে পাড়ি দেওয়া হচ্ছে।

سمى النبي صلى الله عليه وسلم القصر يوما وليلة *

রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন একরাত্রকে সফর বা কসর বলতেন। (বুখারী ১ম খণ্ড ঃ ১৪৮ পৃষ্ঠা)

এবং ইমাম শওকানী বলেছেন, "যতটা পথ দূরে গেলে পথিক নিজেকে মুসাফির বলে মনে করতে পারে তত দূরের রাস্তায় কসর পড়বে।"
(দুরারে মুযীয়াহ শরহে দুরারে বাহিয়া, ৬৯ পৃষ্ঠা)

এই সব চিন্তা করে এবং ৪ বরূদ বা ৪৮ মাইল, ইং ৫২ মাইল এর কমে অথবা ২ (দুই) মানযিলের কমে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কসর পড়তেন না–এই সব বিভিন্ন রিওয়ায়াতের প্রতি লক্ষ্য করে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় কয়েকটি বিষয় নির্ণয় করা যেতে পারেঃ

১নং। শুধু পায়ে হেঁটে ৩ দিনের পথ অতিক্রমকারীর কসরের হুকুম রাখা।

২নং। অন্যান্য সমূদয় যানবাহনে একদিন একরাত্র অতিবাহিত করায় কসর পড়া।

৩নং। পথিক নিজেকে যতক্ষণ মুসাফির মনে করে ততক্ষণ কসর পড়া।

৪নং। যেহেতু অনেক মুহাদ্দিস ও ইমামের নিকট ইহা عزيمت অর্থাৎ অবশ্য অবধারিত নয় বরং رخصت, অর্থাৎ মুহ্লত বা অবকাশ দেয়া হয়েছে। অতএব মুসাফির ইচ্ছা করলে কসরও পড়তে পারে এবং ইচ্ছা করলে পূর্ণ নামাযও পড়তে পারে।

৫নং। বুখারীর হাদীস يقصر الصلوة اذا خرج من موضعه

বাড়ী থেকে সফরের নিয়তে বাহির হলে অর্থাৎ পথিক নিজেকে মুসাফির মনে করে পথ চললে কসর করবে।

সফরে সুন্নাত নামায

সফরে সুন্নাত না পড়া এবং পড়া সম্বন্ধে দুই রকম হাদীসই পাওয়া যায়।

সুন্নাত না পড়া সম্বন্ধীয় হাদীস

ইবনে উমর হতে বর্ণিত–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে, আবূ বকর, ওমর এবং ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

সাথে সফরে নামায পড়েছি।

তাঁরা যোহর আসর দুই রাকা'আত করে পড়তেন এবং আগে পরে কোন নামায পড়তেন না। (তিরমিযী)

অধিকন্তু তিনি বলতেন, সফরে নামাযই যখন দুই রাকা'আত মাফ, তবে সুন্নাত আর কেন পড়ব? সুন্নাতই যদি পড়ি তা হলে ফরয পুরা পড়াই উচিত। ফরযই যখন অর্ধেক পড়তে হয় তখন সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ায় কোন আপত্তি থাকতে পারে না। (বুখারী,মুসলিম)

সুন্নাত পড়া সম্বন্ধে হাদীস

অন্য হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সফরে যোহরের পূর্বে দুই রাকা'আত সুন্নাত ছাড়তেন না। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সফরে যোহরের পর দুই রাকা'আত সুন্নাত পড়তেন। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) মাগরিবের পর দুই রাকা'আত সুন্নাত পড়তেন। (তিরমিযী)

সফরে সুন্নাত পড়া সম্বন্ধে যখন দুই প্রকার হাদীসই পাওয়া যায় তখন বুঝা যাচ্ছে যে, সফরে সুন্নাত নামায পড়া এখতিয়ারী বিষয়। মুসাফির ইচ্ছা করলে সুন্নাত পড়তে পারে কিংবা ছাড়তেও পারে। পড়লে সওয়াব পাবে, না পড়লে গুনাহ হবে না।

ইমাম মুসাফির হলে

মুকীম ও মুসাফির উভয় পক্ষের লোকের মাঝে মুসাফির লোক ইমাম হলে ইমাম তাঁর দু রাকা'আত ফরয পড়ে সালাম ফিরাবেন এবং মুকীম মুক্তাদীগণ পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ নামায আদায় করে নিবে। তবে মুকীম ইমামের পিছনে মুসাফির মুক্তাদী হলে ইমামের সঙ্গে পুরা নামায পড়বে।

সফরে নামায জমা করার বিবরণ

সফরের হালতে যোহর ও আসর এক সাথে জমা করে আসরের সময় আদায় করাকে বলা হয় জমা-তাখীরী এবং ঐ দুই নামায যোহরের সময় আদায়

করাকে বলা হয় জমা তাকদীমী। উভয় প্রকারই জায়েয। এইভাবে মাগরিব ও এশা এক সঙ্গে মাগরিবের সময় অথবা এশার সময় আদায় করা জায়েয।
(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

তাই বলে আলস্য করে বাড়ীতে বসে অকারণে দুই নামায একত্র জমা করে পড়া জায়িয হবে না। তবে বিশেষ ওযর ও অসুবিধা বশতঃ বাড়ীতেও নামায জমা করা চলে। (মুসলিম)

হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে তাসবীহ্ পাঠ করা

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, তোমরা হাতের আঙ্গুলের গিরা দ্বারা তাসবীহ তাহলীল গুণে গুণে পাঠ করবে। কারণ ঐ হাতের আঙ্গুলগুলিও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা সম্বন্ধে কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসিত হ'বে এবং কথা বলবে। (আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ডান এবং বাম উভয় হস্তের করের সাহায্যে তাস্বীহ পড়া যায়। কেউ কেউ তাসবীহ পাঠের জন্য স্বতন্ত্র মালা বা তাসবীহ্ ছড়া ব্যবহার করে থাকেন। এটা সুন্নাতের অনুকূল নয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশমত সুন্নাত মোতাবেক হাতের আঙ্গুলের গিরা দ্বারা তাসবীহ পাঠ করাই উত্তম।

ঈদের নামায

ঈদ অর্থ খুশী, খুশীর পর্ব বা আনন্দ উৎসব।

قيل سمى عيداً لانه يعود كل سنة بفرح مجدد *

অর্থাৎ ঃ কথিত আছে ইহাকে এইজন্য "ঈদ" বলা হয় যে, ইহা প্রত্যেক বৎসর নূতন খুশী নিয়ে ফিরে আসে। (আলমুনজেদ, ৫৬২ পৃঃ)

ঈদ দুইটি, রামাযান শেষের ঈদ এবং কুরবানীর ঈদ। রমযানের ঈদকে ঈদুল ফিতর্ এবং কুরবানীর ঈদকে ঈদুল আযহা বা ঈদুয্ যোহা বলা হয়। (বুখারী)

ঈদের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। (বুখারী)

ঈদের দিন গোসল করা সুন্নাত। (মালেক, ইবনে মাজাহ)

ঈদুল ফিতর নামাযের সময় সূর্যোদয়ের পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত আর

ঈদুয্ যোহার নামায সূর্যোদয় থেকে সোয়া প্রহর বেলার ভিতর পড়া বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতরের নামায বিলম্ব করে এবং ঈদুয্ যোহার নামায সকাল সকাল পড়তে বলেছেন।

(ইমাম শাফেয়ী, কিতাবুল উম)

ঈদের নামায মাঠে ময়দানে বা খোলা জায়গায় পড়তে হয়। তবে বৃষ্টির দরুণ ঈদের নামায মসজিদে পড়া জায়েয আছে। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু খেজুর কিংবা মিষ্টি খেয়ে এবং ঈদুয্‌যোহার দিন কিছু না খেয়ে মাঠে যেতেন।

(বুখারী, আহমদ)

ঈদের নামাযের আগে পরে সুন্নাত বা নফল নামায পড়া নিষেধ।

(বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

ঈদের নামাযে ইমামের সম্মুখে সুতরা (লাঠি, খুঁটি প্রভৃতি গেড়ে) রাখা সুন্নাত। (বুখারী)

ঈদগাহে পদব্রোজে গমন করা সুন্নাত। তবে ওযর বা কারণ বশতঃ যানবাহনে আরোহণ করার অনুমতি আছে। (তিরমিযী, যাদুল মায়াদ)

ঈদের দিনে ঈদগাহে যাতায়াতের রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত।

(বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

ঈদের ময়দানে মিম্বর বয়ে নিয়ে যাওয়ার কিংবা স্থায়ী মিম্বর নির্মাণ করার আবশ্যকতা নেই। (বুখারী, ১ম খঃ ১৩১ পৃষ্ঠা)

কিন্তু পূর্ব থেকে ঈদগাহে মিম্বর নির্মিত থাকলে তাতে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করা অবৈধ নয়। (যাদুল মাআদ,১ম খণ্ডঃ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

ঈদের নামাযে তাকবীরের সংখ্যা

ঈদের নামাযে তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। আমরা এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ সহীহ হাদীস দ্বারা নিরপেক্ষ আলোচনার চেষ্টা করব। **ঈদের নামাযে তাকবীরের সংখ্যা সম্বন্ধে সিহাহ সিত্তার ছয় কিতাবের মধ্যে বুখারী, মুসলিম এবং নাসায়ী শরীফে কোন সংখ্যার উল্লেখ নাই।** অবশিষ্ট ৩ কিতাব – তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং ইবনে মাজাতে তকবীর সম্বন্ধে যা আছে আমরা প্রথমে তা আলোচনা করবো।

প্রথম হাদীস গ্রন্থ–তিরমিযী

তিরমিযী শরীফে ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে ৫ (পাঁচটি) এবং ৯ (নয়) তাকবীর সম্বন্ধে মাত্র ১টি হাদীসের উল্লেখ আছে, অন্য কোন সংখ্যার উল্লেখ নাই। ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে তিরমিযীর–

১ম হাদীস

عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعاً قبل القراة وفي الاخرة خمساً قبل القراة *

অর্থ ঃ আবদুল্লার পুত্র কাসীর হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদের নামাযে প্রথম রাকাতে কিরায়াতের পূর্বে ৭ (সাত) তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরায়াতের পূর্বে ৫ (পাঁচ) তাকবীর দিতেন।

২য় হাদীস

وفي الباب عن عائشة رضى الله عنها ....

এ হাদীসটি ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ 'আয়িশা (রাঃ) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩য় হাদীস وابن عمر رضى الله عنهما ....

এ হাদীসটিও ১২ তাকবীর সম্বন্ধে ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪র্থ হাদীস

وعبد الله ابن عمر رضى الله عنهما......

এ হাদীসটিও ১২ তাকবীর সম্বন্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

قال ابو عيسى حديث جد كثير حديث حسن و هو احسن شيئ روى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و غيرهم *

অর্থ ঃ ইমাম আবূ ঈছা অর্থাৎ তিরমিযী বলেন, কাসীরের দাদার হাদীস হাসান-সুন্দর এবং এটা তাকবীর অধ্যায়ে সার্বোত্তম হাদীস যা রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর কতিপয় বিদ্বান সাহাবা এবং সাহাবা ছাড়া অন্যান্যরাও আমল করে গেছেন অর্থাৎ তাঁরা ১২ তাকবীরেই ঈদের নামায পড়েছেন।

৫ম হাদীস

و هكذا روى عن ابى هريرة انه صلى بالمدينة نحو هذه الصلوة وهو قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والشافعى واحمد واسحاق *

অর্থ ঃ অনুরূপ ১২ তাকবীর সম্বন্ধে আবূ হুরায়রাহ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি মদীনাতে ১২ তাক্বীরে নামায পড়তেন এবং এটা মদীনাবাসীদের উক্তি। আর মালেক ইব্‌নে আনাস, শাফেয়ী, আহম্মদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাকেরও এই মত। [তিরমিযী, ১ম খণ্ড ঃ ৭০ পৃষ্ঠা]

৯ (নয়) তাকবীর সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে মাত্র একটি রিওয়ায়াত আছে। সেটি এই ঃ

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال فى التكبير فى العيدين تسع تكبيرات فى الركعة الاولى خمس تكبيرات قبل القراة وفى الركعة الثانية يبدأ بالقراة ثم يكبر اربعاً مع تكبيرات الركوع وقد روى عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول اهل الكوفة وبه يقول سفيان الثورى *

অর্থ ঃ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বলেছেন, দুই ঈদেরই তাক্বীর সংখ্যা ৯ (নয়)। প্রথম রাকাতে পাঁচ তাক্বীর কেরা'আতের পূর্ব এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে কেরা'আত শুরু করবে, অতঃপর রুকুর তাক্বীরসহ চার তাক্বীর দিবে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) থেকে একাধিক সাহাবা কর্তৃক এই-রূপ বর্ণিত হয়েছে। ইহা কুফাবাসীদের মত এবং সুফীয়ান সাউরীরও এই মত। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, ৭০পৃষ্ঠা)

এখানে প্রণিধানযোগ্য কথা এই যে, এই হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত কিন্তু তিনি একথা বলেন না যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কে এইরূপভাবে নয় তাক্বীর দিতে দেখেছি কিংবা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এইরূপ তাক্বীর দিতে বলেছেন। বরং এটা তাঁর ব্যক্তিগত উক্তি মাত্র, আচরণ মাত্র।

দ্বিতীয় হাদীস গ্রন্থ –আবূ দাউদ

আবূ দাউদ শরীফে ১২ তাক্বীর সম্বন্ধে ৪ (চারটি) আর ৪ তাক্বীর সম্বন্ধে মাত্র একটি হাদীস পাওয়া যায়। অন্যান্য সংখ্যার কোন উল্লেখ নাই।

১২ বার তাক্বীর সম্বন্ধে আবূ দাউদের হাদীসসমূহ ঃ

১ম হাদীস

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر والاضحى فى الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً *

অর্থ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত- রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল আযহার প্রথম রাকা'আতে ৭ (সাত) এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে ৫ তাক্বীর দিতেন।

২য় হাদীস

عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب باسناده ومعناه قال سوى تكبيرات الركوع

অর্থ ঃ খালেদ ইবনে ইয়াজিদ হতে বর্ণিত- তিনি ইবনে শিহাব হতে অনুরূপ ১২ তাকবীরের কথা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি রুকুদ্বয়ের তাকবীর ছাড়াই ১২ তাকবীরের কথা বলেছেন।

৩য় হাদীস

عن عبد الله ابن عمروبن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير فى الفطر سبع فى الاولى وخمس فى الاخرة والقراة بعدها كلتيهما*

অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঈদুল ফিতরের তাকবীর প্রথম রাকা'আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ বার দিবে এবং উভয় রাকা'আতেই কিরায়াত তাকবীরের পরে পাঠ করবে।

৪র্থ হাদীস

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر فى الاولى سبعا ثم يقرأ ثم يقوم فيكبر اربعاً ثم يقرأ ثم ركع قال ابو داؤد رواه وكيع ابن المبارك قال سبعاً وخمسا*

অর্থ ঃ আমর ইবনে শুয়ায়িব হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতার নিকট হতে, তিনি তার দাদার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতরে প্রথম রাকা'আতে সাত তাকবীর দিতেন, অতঃপর কিরায়াত করতেন, তারপর দ্বিতীয় রাকা'আতে দাঁড়াতেন এবং ৪ তাকবীর দিয়ে কিরায়াত করতেন, অতঃপর রুকু করতেন। আবূ দাউদ বলেছেন, ওকী ইবনুল মুবারক বলেছেন, তাকবীর সাত এবং পাঁচ। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা)

চার তাকবীর সম্বন্ধে আবূ দাউদের ১টি হাদীস

عن مكحول قال اخبرنى ابوعائشة جليس لابى هريرة ان سعيد ابن العاص سال ابا موسى الاشعرى وحذيفة اليمن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الاضحى والفطرفقال ابو موسى كان يكبر اربعاً تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق *

অর্থ ঃ মকহুল হতে বর্ণিত, আবূ হুরায়রার নিকট উপবিষ্ট আবূ আয়েশা খবর দিয়েছেন যে, সাঈদ ইবনুল আস আবূ মূসা আশ'আরী এবং হুযায়ফাতুল ইয়ামনকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরে কিভাবে তাকবীর দিতেন ? আবূ মূসা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) চার তাকবীর দিতেন জানাযার তকবীরের মত; হুযায়ফা বললেন, তিনি সত্য বলেছেন।(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১৬৩ পৃঃ)

তৃতীয় হাদীস গ্রন্থ—ইবনে মাজাহ

ইবনে মাজাহ কিতাবে ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে ৪টি হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্য কোন সংখ্যার উল্লেখ নেই।

১ম হাদীস

عن عبد الله الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنى ابى عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الاولى سبعا قبل القراءة وفى الاخيرة خمساً قبل القراءة

অর্থ ঃ সা'আদের পুত্র আবদুর রহমান কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি

ওয়া সাল্লাম)-এর মুয়াযযিন আম্মার ইবনে সা'আদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার পিতা হাদীস বয়ান করেছেন তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদের নামাযে প্রথম রাকা'আতে কিরায়াতের পূর্বে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকা'আতে কিরায়াতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন। (ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড ৯২ পৃষ্ঠা)

২য় হাদীস

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر فى صلوة العيد سبعاً وخمساً *

অর্থ ঃ শু'আয়িবের পুত্র আমর–তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ঈদের নামাযে সাত ও পাঁচ তাকবীর (মোট ১২ তাকবীর) প্রদান করেছেন।
(ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড ৯২ পৃষ্ঠা)

ইবনে মাজায় উল্লিখিত ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে বর্ণিত আমর ইবনে শু'আইবের হাদীস সম্পর্কে ইমাম যুরকানী লিখেছেন, আমর বিন শু'আইবের হাদীস ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, উক্ত হাদীস বিশুদ্ধ। (যুরকানী শরহে মুয়াত্তা ৩২৭ পৃষ্ঠা)

৩য় হাদীস

عن كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين سبعا فى الاولى وخمسا فى الاخيرة

অর্থ ঃ আবদুল্লাহর পুত্র কাসির ইবনে আমর ইবনে আউফ তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্হ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদে প্রথমে সাত, পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন।
(ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড ৯২ পৃষ্ঠা)

৪র্থ হাদীস

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فى الفطر والاضحى

سبعا وخمسا سوى تكبيرات الركوع *

অর্থ ঃ 'আয়িশা সিদ্দিকা হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতরে ও ঈদুল আযহাতে সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন–রুকুর তাকবীরগুলি ছাড়া। (ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড ৯২ পৃষ্ঠা)

পূর্বেই বলা হয়েছে, সিহাহ সিত্তার মধ্যে তিন কিতাব–বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ীতে ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। অবশিষ্ট তিন কিতাবের মধ্যে তিরমিযীতে ১২ তাকবীর সম্বন্ধে ৫টি, আবূ দাউদে ১২ তাকবীর সম্বন্ধে ৪টি এবং ইবনে মাজাতে ১২ তাকবীর সম্বন্ধে ৪টি এই মোট ১৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য সংখ্যার মধ্যে শুধু ৯ (নয়) তাকবীর সম্বন্ধে মাত্র একটি হাদীস ও ৪ তাকবীর সম্বন্ধে মাত্র ১টি হাদীসের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

এদেশে হানাফীরদেরকে ৬ (ছয়) তাকবীর ঈদের নামায পড়তে দেখা যায় কিন্তু সিহাহ্ সিত্তার ছয় কিতাবের কোন কিতাবে ৬ (ছয়) তাকবীরর কথা ঘুর্ণাক্ষরেও উল্লিখিত হয়নি।

এক নজরে সিহাহ্ সিত্তার কিতাবে ১২ তাকবীর

(১) বুখারী (২) মুসলিম ও (৩) নাসায়ীতে ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই।
(৪) তিরমিযীতে ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে ৫টি
(৫) আবূ দাউদে ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে ৪টি
(৬) ইবনে মাজাতে ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে ৪টি

১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে মোট ১৩টি হাদীস এসেছে, ৬ (ছয়) তাকবীর উল্লেখ সিহাহ সিত্তার কিতাবে মোটেই নাই এবং এটা কোন লুকোচুরীর কথাও নয়–কিতাব খুললেই প্রমাণ হয়ে যাবে ; অতএব পাঠক পাঠিকা ভাই বোনদের খিদমতে বিনীত আরজ, আপনারা সুস্থ বিচার-বুদ্ধি এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিষয়টি গভীরভাবে বিচার করবেন। ঈদের নামায একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান,

ঈদের নামাযের তাকবীর তার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। কাজেই এটা অবহেলার জিনিস মোটেই নয়।

সিহাহ্ সিত্তার বাইরে হাদীসের কিতাবসমূহে ১২ তাকবীর

চতুর্থ হাদীস গ্রন্থ -মুয়াত্তা মালিক

মুয়াত্তা মালিকের হাদীসে শুধু ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে ২টি হাদীস পাওয়া যায়, অন্যান্য কোন সংখ্যা উল্লেখ নাই।

প্রথম হাদীস

عن نافع مولى عبد الله بن عمر انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريرة فكبر فى الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفى الاخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة قال مالك وهو الامر عندنا *

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের গোলাম নাফি' (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে আবূ হুরায়রার সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাকা'আতে সাত তাকবীর কিরায়াতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে ৫ (পাঁচ) তাকবীর কিরায়াতের পূর্বে পাঠ করতেন। ইমাম মালিক বলেন, এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত। (মুয়াত্তা মালেক, ৬৩ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় হাদীস

قال يحي قال مالك فى رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلواة يوم العيد انه لا يرى عليه صلوة فى المصلى ولا في بيته وانه ان صلى فى المصلى او فى بيته لم ارى بذالك باسا ويكبر سبعا فى الاولى قبل القراءة وخمسا فى الثانية قبل القراءة *

অর্থ ঃ ইয়াহ্ইয়া বলেন, ইমাম মালিক ফরমিয়েছেন, তিনি এমন এক ব্যক্তিকে পেলেন, যিনি ঈদের নামায থেকে ফিরছিলেন, তিনি বাড়িতে অথবা ঈদের মুসাল্লাতে অন্য কোন নামায পড়েননি–আর যদি কিছু পড়ে থাকেন তবে আমি তাতে অসুবিধা মনে করি না, তিনি প্রথম রাকা'আতে কিরায়াতের পূর্বে সাত তাকবীর দিলেন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে কিরায়াতের পূর্বে ৫ (পাঁচ) তাকবীর।

পঞ্চম হাদীস গ্রন্থ– বায়হাকী

ইমাম বায়হাকী স্বীয় গ্রন্থ সুনানে কুবরায় হাদীস বর্ণনা করেছেন,

عن الزهرى عن حفص عن ابيه سعد بن قرظ ان من السنة في الاضحى والفطر سبع تكبيرات فى الاولى قبل القراة وخمس تكبيرات فى الثانية قبل القراءة *

অর্থ ঃ সা'আদ ইব্‌নে কুরয প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের (বার তাকবীর পাঠ করা) প্রথম রাকা'আতে কিরায়াতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরায়াতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।

ষষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ– মুসনাদে বায্‌যার

عن عبد الرحمن بن عوف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج العنزة فى العيدين حتى يصلى اليها فكان يكبر ثلث عشرة تكبيرات وكان ابو بكر وعمر يفعلان ذالك *

অর্থ ঃ আবদুর রহমান ইবনে আউফের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে যে, দুই ঈদের নামাযে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য তীর ধনুকের কামান বাহির করা হতো, উহাকে সুতরা স্বরূপ সম্মুখে রেখে তিনি নামায সম্পাদন করতেন। তিনি দুই ঈদের নামাযে তের তাকবীর উচ্চারণ করতেন (সম্ভবতঃ এখানে তাহ্‌রীমার তাকবীরকে বার তাকবীর সাথে সংযোজিত করে তের তাকবীর বলা হয়েছে) আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারুক এই রূপই করতেন। হাফিয আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী তালখিসুল হাবীর গ্রন্থে এই হাদীসের অবতারণা করেছেন।

সপ্তম হাদীস গ্রন্থ–মুছান্নাফে আবদুর রায্‌যাক

মুছান্নাফে আবদুর রায্‌যাক নামক হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان على يكبر فى الاضحى والفطر والاستسقاء سبعا فى الاولى و خمسا فى الاخيرة ويصلى قبل الخطبة و يجهر بالقراءة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر وعمر و

عثمان يفعلان ذالك *

অর্থ ঃ জাফর ইব্নে মুহাম্মাদের প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মদ বাকেরের বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) দুই ঈদ ও ইসতিসকা নামাযে প্রথম রাকা'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ তাকবীর উচ্চারণ করতেন। আর খুৎবার আগেই নামায পড়তেন এবং উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), উমর ফারূক (রাঃ) ও ওছমান গণী (রাঃ)ও এইরূপ করতেন।

অষ্টম হাদীসগ্রন্থ– দারকুতনী

'দারকুতনী' নামক সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين فى الاولي سبعاً وفى الاخرى خمسا وكان يبدأ الصلوة قبل الخطبة *

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ হতে বর্ণিত–তিনি তাঁর পিতা এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদের নামাযে প্রথম রাকা'আ'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকা'আ'আতে পাঁচ তাকবীর উচ্চারণ করতেন। আর খুৎবার পূর্বে প্রথমেই তিনি নামায শুরু করতেন।

নবম হাদীস গ্রন্থ–তাবারানী

তাবারানী নামক প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الاولى وخمسا فى الاخيرة *

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদের নামাযে বার তাকবীর বলতেন, প্রথম রাকা'আ'আত সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকা'আ'আতে পাঁচ তাকবীর।

দশম হাদীস গ্রন্থ–শরহে মা'আনীল আসার

"শরহে মা'আনীল আসার" নামক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابي واقد الليثي وعائشة رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الفطر والاضحى فكبر فى الاولى سبعا وقرأ "ق، والقرأن المجيد" وفى الثانية خمسا وقرأ "اقتربت الساعة وانشق القمر" *

আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রাঃ) ও আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিবসে জনগণকে নিয়ে নামায পড়ালেন (ইমামত করলেন)। তিনি প্রথম রাকা'আতে সাত তাকবীর উচ্চারণ করে "সূরা কাফ" পাঠ করেছেন আর দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ তাকবীর উচ্চারণ করে 'সূরা ইকতারাবাতিস সা'আতু ওয়ান শাক্কাল ক্বামার" পাঠ করেছেন।

উপরোল্লিখিত ১০টি (দশ) হাদীস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ২২টি (বাইশ) হাদীস থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হলো যে, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাগণ ১২ (বার) তাকবীর ঈদের নামায পড়তেন। অতঃপর ইহার উপর তাঁর সাহাবাদের আরও আমলের প্রমাণ এবং তাবেয়ীন ও ইমামদের কি আমল ছিল তাও আমরা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করছি।

সাহাবা তাবিয়ীন ও ইমামগণের আমল

قال العراقى و هو قول اكثراهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة قال هو روى عن عمر وعلي وابى هريرة وابى سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وابى ايوب و زيد بن ثابت وعائشة و هو قول الفقهاء السبعة من اهل المدينة و عمر بن عبد العزيز والزهري و مكحول و به يقول مالك والاوزاعي والشافعي و احمد واسحاق * (نيل الاوطار)

অর্থাৎ ঃ ইরাকী বলেন, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে যারা ছিলেন জ্ঞানে বিদ্যায় পারদর্শী এবং ইমামগণের অধিকাংশই এইরূপই বলিয়াছেন, ওমর (রাঃ), আলী (রাঃ), আবূ হুরায়রা (রাঃ), জাবির (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে

আব্বাস (রাঃ), আবূ আইয়ুব (রাঃ), যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) ও উম্মুল মুমেনীন 'আয়িশা (রাঃ) প্রমূখ সাহাবায়ে কিরাম হতেও বার তাক্বীরের উপর আমলের 'রিওয়ায়াত' এসেছে। আর মদীনার সাতজন খ্যাতনামা ফকীহ্ বিদ্বান এবং উমর ইব্নে আব্দুল আযীয, ইমাম যুহরী ও ইমাম মকহূলেরও এটাই অভিমত এবং ইমাম মালিক, ইমাম আওযায়ী, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাকও এরূপই বলেছেন। (নায়লুল আওতার)

ইমাম আবূ হানীফার শিষ্যদ্বয়ের আমল

ইমাম আবূ হানীফার রহঃ শ্রেষ্ঠ শিষ্যদ্বয়– ইমাম আবূ ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ১২ তক্বীরের উপর আমল করেছেন।

روى عن ابى يوسف و محمد انهما فعلا ذالك *

অর্থঃ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ এর প্রমুখাৎ বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়েই বার তক্বীরের উপর আমল করতেন। (রাদ্দুল মুহতার, ৬৬৪ পৃষ্ঠা)

দুঃখের বিষয় ১২ তাকবীরের স্বপক্ষে এত অধিক হাদীস ও অকাট্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে অনেকে ৬ তাক্বীরে ঈদের নামায পড়েন। আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, ছয় তাকবীর সম্বন্ধে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, প্রতিপক্ষ তাদের মতের স্বপক্ষে দুইটি হাদীস পেশ করে থাকেন। সেগুলো নিম্নে পেশ করছি।

ছয় তক্বীরের আলোচনা

হানাফীগণ তাদের মতের সপক্ষে দু'টি হাদীস পেশ করে থাকেন,

হানাফীদের দলীলের স্বপক্ষে ১ম হাদীস

عن ابى عائشة ان سعيد بن العاص سال ابا موسى الاشعرى و حذيفة بن اليمان كيف كان تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاضحى والفطر فقال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيرة الجنائز قال حذيفة صدق رواه ابو داؤد *

অর্থঃ আবূ 'আয়িশা বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্নুল 'আস আবূ মূছা আশ'আরী ও হুযাইফা ইব্নে ইয়ামান (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুই ঈদের নামাযের তাকবীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ মূছা আশ'আরী উত্তরে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জানাযার নামাযের ন্যায় ঈদের নামাযেও চার তাকবীর উচ্চারণ করতেন। হুযাইফা বললেন, আবূ মূছা আশ'আরী সত্য বলেছেন।

(আবূদাউদ)

বিচার ও পর্যালোচনা

প্রথমত ঃ এই হাদীসটি মারফূ' হওয়া সঠিক নয়, কারণ অন্যান্য সকল রাবীর রিওয়ায়াতের প্রতিকূলে- মাত্র আবূ 'আয়িশা একাকীই এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ আবূ আ'য়েশা একজন মাজহুল বা অপরিচিত বর্ণনাকারী। সুতরাং উসূলে হাদীসের স্বীকৃত নিয়ম অনুসারে এটা মরফু হওয়া সম্ভব নয়।

"মীযানুল ই'তিদাল" নামক রিজাল শাস্ত্রে (চরিতাভিধান) বলা হয়েছে, আবূ 'আয়েশা মাজহুল অর্থাৎ অপরিচিত।

হাফিয যায়লা'য়ী 'তাখরীজে হেদায়ায়' লিখেছেন, আবূ 'আয়িশা সম্বন্ধে আমরা ওয়াকেফহাল নই। হিদায়ার হাশীয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম ইব্নে হযম বলেন, আবূ 'আয়িশা মাজহুল বা অপরিচিত।

তৃতীয়তঃ এই হাদীসে ৪ তাকবীরের বর্ণনা আছে, ৬ তাকবীরের কোন উল্লেখ নাই।

হানাফীদের দলীলের স্বপক্ষে ২য় হাদীস

"মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক ও মুসান্নাফ আবী শায়বাহ- উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,

اخبر معمرعن علقمة و اسود قال كان ابن مسعودجالسا وعنده حذيفة و ابو موسى الاشعرى فسالهم سعيد بن العاص عن التكبير فى صلوة العيد فقال حذيفة سل الاشعرى فقال الاشعرى فسئل عبد الله فانه اقدمنا فسئله فقال ابي مسعود يكبر اربعاثم يقراء ثم يكبر فيركع فيقوم فى الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا بعد القراءة *

অর্থঃ মা'অমর– আলকামা ও আসওয়াদ হতে শুনে বলেছেন যে, ইব্‌নে মসউদ উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। তাঁর নিকট হুযাইফা ও আবূ মুছা আশআরী উপস্থিত ছিলেন। সাঈদ ইব্‌নুল আস তাঁদের নিকট ঈদের নামাযের তাকবীর সম্বন্ধে জানতে চাইলে হুযাইফা আবূ মূছা 'আশআরীকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, তখন আবূ মূছা 'আশআরী বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করুন, কেননা তিনি আমাদের সকলের অগ্রণী। সুতরাং সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ উত্তরে বললেন, চার তাকবীর বলে কিরায়াত পাঠ করে তাকবীর বলে রুকু করবে, অতঃপর দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়িয়ে কিরায়াত পাঠ করে কিরায়াতের পর চার তাকবীর বলবে।

বিচার ও পর্যালোচনা

এই হাদীসটিও দুর্বল, কারণ এই হাদীসের সনদ সূত্রে আবদুর রহমান ইবনে শওহান নামক একজন রাবী আছেন যার সম্বন্ধে রিজালশাস্ত্রে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। আল্লামা যায়লায়ী তাখরীজে হেদায়ায় লিখেছেন, ইমাম ইবনে মুঈন আবদুর রহমানকে দুর্বল বলেছেন। **এটা তো গেল রিওয়ায়াতের কথা। কিন্তু এই হাদীসেও ৬ তাকবীরর কোন উল্লেখ নাই।**

এখন আসল মাসআলাটা সম্বন্ধে একটু সুস্থ বিচার বুদ্ধি ও মুক্ত বিবেক নিয়ে বিচার করলে বুঝা যাবে ব্যাপারটা কি। সিহাহ সিত্তাসহ দশটি বড় বড় হাদীস গ্রন্থের ২২ টি (বাইশ) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাগণ ১২ (বার) তাকবীর ঈদের নামায পড়েছেন এবং তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণও ১২ (বার) তাকবীরে – এমন কি ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং আহমদ বিন্ হাম্বলও ১২ (বার) তাকবীরে ঈদের নামায পড়েছেন। অথচ এখানে এক হাদীসে বলা হলো, জানাযার নামাযের মত চার তাকবীর দিতে হবে। জানাযার নামাযে কোন রাক'আত নাই আর ঈদের নামাযে আছে দুই রাক'আত। তাহলে এই হাদীসের মর্ম হয়ঃ শুধু ৪ (চার) তাকবীর, আর না হয় দুই রাক'আতে ৪×২=৮ (আট) তাকবীর দিতে হবে, ছয়ের তো কোনই উল্লেখ নাই।

পাঠক পাঠিকা একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন ২ নং হাদীসটিতেও অনুরূপ বলা হলো ৪×২=৮। আশ্চর্যের কথা ৬ (ছয়) এর কোন নাম গন্ধও নাই। আরও

মজার ব্যাপার হলো, সেই আট তাকবীর আবার প্রথম রাক'আতে কিরায়াতের পূর্বে ৪ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরায়াতের পর রুকূর পূর্বে ৪ (চার) তাকবীর দিতে হবে। আরও প্রণিধানযোগ্য যে, এই যে উলট পালট করে তাকবীরের কথা বলা হলো, এটা কি জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর আমল না সহাবাদের আমল –তার কোন পাত্তা নেই। এটা শুধু ইব্‌নে মাসউদের (রাঃ) উক্তি। এখন বিচার করুন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর এবং আবূ বকর, উমর উসমান, আলী ও অন্যান্য সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-দের আমল যে ১২ (বার) তাকবীর সেটাই গ্রহণযোগ্য, না একমাত্র ইব্‌নে মাসউদের উক্তি প্রতিপালনীয়? অধিকন্তু খাঁটি মুসলমান হিসাবে সিহাহ সিত্তার হাদীসের আমলকারী বলে দাবী করবেন আর সিহাহ সিত্তার হাদীস এবং তার সমর্থক হাদীস পরিত্যাগ করবেন এটা কেমন কথা? আরও চিন্তার বিষয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন, সাহাবী ইব্‌নে মাসউদের বহু মাসআলায় ভুল আছে। ❑

(দেখুন মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানিফা)

ঈদুল ফিতরের দিবসে কর্তব্য

১। ঈদুল ফিতরের দিন ভোরে ক্ষৌরকার্য করে গোসল করে কিছু মিষ্টি খেয়ে তারপর তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদ্‌গাহের দিকে রওয়ানা হবে এবং একটু দেরী করে নামায পড়বে। (ইব্‌নে খোযায়মা, শাফিয়ী)

২। ঈদের ২/১ দিন পূর্বেও ফিৎরা আদায় করা জায়িয। (বুখারী ঃ ২০৫ পৃষ্ঠা)

৩। রামাযানের শেষ দিন অথবা ঈদুল ফিত্‌রের দিন মাঠে যাওয়ার পূর্বে ছোট বড় ছেলে মেয়ে. চাকর গোলাম প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সাদ্‌াকাতুল ফিত্‌র অর্থাৎ ফিৎরা আদায় করে গরীব মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করবে। (বুখারী)

❑ *যারা আরবী পড়তে পারেন না তাদের জানার সুবিধার্থে ১২ তাকবীরে ঈদের নামায সম্পর্কিত হাদীস দেখতে চাইলে বাংলা ভাষায় অনূদিত নিম্নলিখিত হাদীসগ্রন্থাবলী দেখুন*

১। আবূ দাউদ শরীফ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত) ২য় খণ্ড হাদীস নং ১১৪৯ ও ১১৫০।

২। তিরমিযী শরীফ ঃ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত) ২য় খণ্ড হাদীস নং ৫৩৬।

৩। মেশকাত ঃ মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী অনূদিত ৩য় খণ্ড হাদীস নং ১৩৫৭।

৪। মেশকাত ঃ মাদ্‌রাসা পাঠ্য ২য় খণ্ড হাদীস নং ১৩৫৭।

ফিৎরা আদায় ও বন্টন

ফিৎরা সম্বন্ধে কেউ কেউ ফিৎরা প্রদানকারীর জন্য ছাহেবে নেছাব (যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত সম্পদের অধিকারী) হওয়ার শর্ত আরোপ করে থাকেন। এটা আদৌ ঠিক নয়। কারণ সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ

عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تودى قبل خروج الناس الى الصلوة *

অর্থঃ ইবনে উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত –রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এক সা' যব ফিৎসা প্রদান করাকে স্বাধীন, দাস, নর-নারী, ছোট-বড় প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ফরয করেছেন এবং তা (ফিতরা) নামাযের জন্য বের হবার পূর্বেই আদায় করার হুকুম দিয়েছেন।

(বুখারী, ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃঃ, মুসলিম, প্রথম খণ্ড ৩১৭ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ২৫ পৃষ্ঠা, তিরমিযী (২) ৮৫ পৃষ্ঠা, মুয়াত্তা মালেক (২১৭ পৃষ্ঠা)।

ফিৎরা এক সা খাদ্য বস্তু অথবা যব, খেজুর, পনীর, কিসমিস্ দ্বারা প্রদান করবে। (বুখারী ২০৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম ৩১৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৮৫ পৃষ্ঠা)

এদেশে প্রধান খাদ্যবস্তু চাল। কাজেই চাল দ্বারা এক সা ফিৎরা আদায় করা উত্তম। (রওযাতুন্ নাদীয়াহ ১৪০ পৃষ্ঠা)

'সা' ইংরেজী মাপে আশি তোলা সেরের প্রায় দুই সের এগার ছটাক (প্রায় আড়াই কেজি) চাউলের ওজন হয়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন,

يجوز اخراج زكوة الفطر من الذرة والدخن والرز والسلت و غير ذالك من غالب قوت بلد المخرج اشترط الشافعي ان لا يودي الا الحب نفسه *

অর্থ ঃ চিনা, বাজরা, চাউল এবং খোসাহীন যব জাতীয় দ্রব্যাদির মধ্যে যে অঞ্চলে যা প্রধান খাদ্য সে অঞ্চলে তা দ্বারা ফিৎরা বাহির করা জায়েয। ইমাম শাফিয়ী বলেন, দানা দ্বারাই ফিৎরা আদায় করা উচিত। ইমাম আহমদের নিকট সকল প্রকার দানা ও ফল যা মানুষের খাদ্য তা দ্বারা ফিৎরা বাহির করা জায়েয।

ইমাম মালেক বলেছেন, যে শহরের লোকের যা প্রধান খাদ্য তদ্বারা ফিৎরা আদায় করবে। (ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন (৩) ৩৪ পৃষ্ঠা)

ধানের ফিৎরা

ধান দ্বারা ফিৎরা আদায় করা যেতে পারে, কিন্তু খোসা বাদে যেন (দুই সের এগার) ছটাক চাল (আড়াই কেজি) টিকে সেই পরিমাণ দান দিতে হবে। ইহা আহ্লে হাদীস বিশিষ্ট আলেমদের ফতোয়া। (তর্জুমানুল হাদীস)

কেউ কেউ আধা সা ফিৎরা দেওয়ার ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তা ঠিক নয়। যেহেতু আধা সা'র হাদীসটি দুর্বল এবং মুহাদ্দিসগণ বলেন, তা মু'আবিয়ার উক্তি। (নস্বুর্রায়া মিসরী (২) ৪০৯ পৃঃ)

ফিৎরার হকদার

কুরআন মাজীদে নিম্ন বর্ণিত আয়াতে যাকাতে ফিৎরার হকদারের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ *

(১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) আদায়কারী (৪) অমুসলিমদের মধ্যে যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা হবে (৫) গোলাম, (৬) ঋণগ্রস্ত (৭) ফী সাবীলিল্লাহ এবং (৮) দুঃস্থ পথিক। (সূরা তাওবা ঃ ৬১)

ফিৎরা জমা করে অতঃপর বণ্টন করা কর্তব্য।

ঈদুল আযহার কর্তব্য

(১) যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদয় হওয়ার পর হতে মুখ, মাথা ইত্যাদির কেশ এবং হাত পায়ের নখ কাটা উচিত নয়। যারা কুরবানী করবে তাদের জন্য তা কর্তন করা বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। তারা স্ব স্ব কুরবানীর পর এবং দ্বীন দরিদ্রের অন্যের কুরবানীর পর নখ চুল কর্তন করবে। দ্বীন দরিদ্রেরা এর জন্য কুরবানীর সওয়াব পাবে। (বুলুগুল আমানী (১৩) ৭০ পৃষ্ঠা, মুসলিম (২) ১৬০ পৃষ্ঠা, বায়হাকী (৯) ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাকিম (৪) ২২০ পৃষ্ঠা)

(২) ৯ই যিলহজ্জের ফজর হতে ১৩ই যিলহজ্জের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয

নামাযের পর উচ্চকণ্ঠে এ তাকবীর পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু অকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

(ইবনে আবী শায়বাহ, ইবনে আবদুল বার, আম্বারুস্ সুনান, নসবুর রায়া, দিরায়া, হাকিম, তালখিসুল হাবীর)

(৩) যিলহজ্জের ১০ তারিখের সূর্য উদিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই গোসল করে তৈল এবং সুগন্ধি মেখে সাধ্যানুসারে উৎকৃষ্ট পোষাকে সজ্জিত হয়ে কিছু অহারাদি না করেই খালি মুখে উচ্চকণ্ঠে উপরিউক্ত তাকবীর ধ্বনি করতে করতে সদলবলে ঈদগাহে রওনা হবে।

(আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, হাকিম, দারকুতনী, নায়লুল আওতার)

(৪) যিলহজ্জ চাঁদের ১০, ১১, ১২ তারিখ সমূহের মধ্যে কুরবানী করা সুন্নাত। **ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যারা কুরবানী করে না রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ঈদগাহের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন।**

(আহমদ, ইবনে মাজাহ, দারকুতনী, হাকিম)

(৫) দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে তারপর যে দাঁত উঠে সেই দাঁতওয়ালা পশু কুরবানী করতে হবে। (মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

যদি দাঁতওয়ালা না পাওয়া যায় তাহলে দাঁতের বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার মত বয়সের হৃষ্টপুষ্ট মেষ জাতীয় পশু কুরবানী জায়েয হবে।

(আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

(৬) ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। করলে তা কুরবানীরূপে গণ্য হবে না। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তাহাবী)

(৭) উট, দুম্বা, গরু, মহিষ ও ছাগল জাতীয় পশু ছাড়া অন্য কোন প্রকার প্রাণীর কুরবানী জায়েয নয়। (কুরআন মাজীদে সূরা আনআম ১৪২-৪৩ আয়াত, সূরা হজ্জ ২৮ আয়াত, যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৩৩৮ পৃষ্ঠা, মুগনী (১১) ৯৯ পৃষ্ঠা, শরহে সিফরুস্ সা'আদাত ৪৭৪ পৃষ্ঠা, তাকমিলায়ে ফতহুল কাদীর (৮) ৬ পৃষ্ঠা)

(৮) মহিষের কুরবানী সম্বন্ধে বিদ্যানগণ মতভেদ করে থাকেন। তবে হক মাআসলা এই যে, মহিষের কুরবানী জায়িয। কারণ এটা চতুষ্পদ গৃহপালিত

হালাল পশুর অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, মহিষের কুরবানী উত্তম। কেননা গরু, ভেড়া, বকরী, মেষ ইত্যাদি হতে বেশী দামী।

(হায়াতুল হায়ওয়ান, তোহফাতুল ওদুদ)

(৯) নিম্নবর্ণিত ত্রুটিযুক্ত পশুর কুরবানী বৈধ হবে না ঃ খোঁড়া, অন্ধ, কানা, রোগা, জীর্ণশীর্ণ, অতিশয় দুর্বল, অর্ধেক কানকাটা বা ফাটা, অর্ধেক শিং ভাঙ্গা, অর্ধেক লেজ কাটা।

(মালিক, আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম, বায়হাকী)

(১০) প্রত্যেক বৎসরে পরিবারভুক্ত সকলের পক্ষ থেকে কুরবানী করতে হবে। (আহমদ, আবূদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনেমাজাহ, আউনুল মা'আবূদ, নায়লুলআওতার)

(১১) এক পরিবারভুক্ত সকল নরনারীর পক্ষ হতে একটি উট বা একটি গরু বা একটি ছাগল কুরবানী করা যথেষ্ট হবে। (বুখারী, আউনুল মা'আবূদ, ফতহুলবারী, বায়হাকী, হাকিম, বুলুগুল আমানী, দারাকুতনী, মুয়াত্তা, কিতাবুল উম, যাদুল মা'আদ, ফতোয়া ইবনে তায়মীয়াহ, মুগনী, তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী)

(১২) বিভিন্ন পরিবার ও স্থানের সাত ব্যক্তি একটি গরুর কুরবানীতে ও দশ ব্যক্তি একটি উটের কুরবানীতে শরীক হতে পারবে।

(আহমদ, হাকেম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

(১৩) প্রত্যেকের কুরবানী স্ব স্ব হস্তে করা উত্তম, অন্ততঃ যবহের সময় তা প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য। (হাকিম)

(১৪) যবহের প্রাক্কালে এই দু'আ বলবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ وَمِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি ঃ আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ ! আমার এবং আমার পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে কবূল কর।

(মুসলিম, আহমদ, আবূ দাউদ, বায়হাকী, তাহাবী)

যবহের সময় ইহাও পাঠ করা মুসতাহাব ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا *

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরযা হানীফাম্ মুসলিমা।

অর্থ ঃ আমি নিজেকে সেই প্রভুর দিকে নিবিষ্ট করলাম, যিনি আকাশ এবং পৃথিবী সমূহকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি (সকল) বাতিল থেকে একনিষ্ট মুসলিম। (আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, বায়হাকী, তাহাবী)

যারা কুরবানী করবে তাদের পক্ষে তার গোশত বিশেষতঃ কলিজা দ্বারা সর্বপ্রথম আহার করা সুন্নাত। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

(১৫) কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক তৃতীয়াংশ স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করবে, এক তৃতীয়াংশ ফকির মিসকীনের মধ্যে বন্টন করবে এবং অপর তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীকে খাওয়াবে।

(মুগনী (১১) ১০৯ পৃষ্ঠা)

(১৬) কুরবানীর চামড়ার মূল্য স্বয়ং ভোগ করবে না, তা ব্যবহার করা জায়েয নয়, বরং তার মূল্য গরীব মিসকীনদেরকে সদকা করবে। (বুলুগুল আমানী)

আকীকা

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে তার চুল কামাবে, নাম রাখবে ও আকীকা দিবে। (আহমদ (১) ১২ পৃষ্ঠা, নাসায়ী (২) ১৮৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী (১) ১৮৩ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ (২) ৬৫ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ (১) ২২৫ পৃষ্ঠা)।

আকীকা ৭ম দিনেই দিতে হবে, কোন অপরিহার্য জরুরী কারণে না পারলে ১৪শ দিনে, তাও না পারলে ২১শ দিনে অবশ্যই দিতে হবে। (হাকিম (৪) ২৩৮ পৃষ্ঠা, **হাদীসটি দুর্বল)**

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, পুত্র সন্তানের জন্য দুইটি এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল আকীকা দিতে হবে। (তিরমিযী (২) ১৮২ পৃষ্ঠা, হাকিম (৪) ২৩৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নাতী হাসান (রাঃ) এবং হুসায়েনের পক্ষ থেকে নিজে একটি করে আকীকা প্রদান করেছেন এবং ফাতিমা (রাঃ) একটি করে ছাগল আকীকা করেছেন। (আবূ দাউদ (২) ৬৬ পৃষ্ঠা, ইবনে খুযায়মাহ, ইবনে জারূদ ৪০৭ পৃষ্ঠা, বুলুগুল মারাম ১০৯ পৃষ্ঠা)

সন্তানের কর্তিত চুলের ওজনে রূপা সদকা করা সুন্নাত। হযরত ফাতিমা (রাঃ) হাসান-হুসায়েনের কর্তিত চুলের ওজনে রূপা সদ্কা করেছেন।
(মুয়াত্তা মালিক ১৮৬ পৃষ্ঠা)

কেউ কেউ বলে থাকে যে, আকীকার পশুর গোশত ছেলেমেয়ের বাপ মা খেতে পারে না। এটা ভ্রান্ত ধারণা, পিতা মাতা আকীকার গোশত নিঃসন্দেহে খেতে পারে। (তুহফাতুল ওদূদ)

আকীকার পশুর গোশত কুরবানীর গোশতের মত গরীব ফকির মিসকীন প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দিবে এবং নিজেও খাবে।
(তুহফাতুল ওদূদ)

কুরবানীর পশু যে সমস্ত ক্রুটিমুক্ত হওয়ার শর্ত আছে আকীকার জন্য সেসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

আকীকার পশু

আকীকার পশু সম্বন্ধে হাদীসে ছাগল বকরির কথাই শুধু উল্লেখ আছে। অন্য কোন পশুর কথা নাই। কাজেই ছাগল বকরি পাওয়া সত্ত্বেও গরু দিয়ে আকীকা দিলে হাদীসের অনুকূল হবে না। তবে যদি এমন কোন এলাকা হয় যেখানে খাসী বকরী মোটেই পাওয়া যায় না সেখানে গরু চলতে পারে। **মনে রাখতে হবে গরু দিলে এক কন্যার জন্য একটি গরু এবং এক পুত্রের জন্য দু'টি গরু দিতে হবে। সাত জন বা কয়েকজনের জন্য একটি গরু দিলে চলবে না।**
(ইমাম ইবনে কাইয়েম (রঃ) তুহফাতুল ওদূদ বিআহকামিল মাওলূদ ২৬ পৃষ্ঠা)

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আকীকা না করার ক্ষতি

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার সন্তান সন্তুতির আকীকা দিবে না সেই অবস্থায় তার শিশু সন্তান মারা গেলে তারা কিয়ামতের দিন তার মা বাপকে শাফায়াত করবে না। (তুহফাতুল ওদুদ ১২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এবং সাহাবাদের স্বর্ণ যুগে কোন মুসলমান নিজ সন্তানদের আকীকা না দিয়ে থাকতেন না। যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজ সন্তানদের আকীকা দেয় না তারা নবীর বিশেষ সুন্নাতের ঘোর বিরোধিতা করার জন্য অবশ্য অবশ্যই গুনাহ্গার হবে।

ইস্‌তিস্‌কা সম্বন্ধে মতামত

ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) নিকট ইসতিসকার জন্য নামায না পড়ে শুধু দু'আ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট ইসতেসকার নামায পড়া সুন্নাত।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং ইসতিসকার নামায পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ইবনে আওয়ান)

ইমাম নাওয়াবী বলেছেন, একমাত্র আবূ হানীফা (রহঃ) ছাড়া অন্যান্য সকল ইমাম এবং মুহাদ্দেসীনের নিকট ইসতিসকার নামায পড়া সুন্নাত।

তা বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

(নাওয়াবী, শরহে মুসলিম ১ম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা)

ইস্‌তিস্‌কার নামায

দেশে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হলে বৃষ্টির অভাবে ফসলাদি মরে যেতে শুরু করলে আল্লাহর নিকট পানি প্রার্থনা করা রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত। বুখারী শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আর খুৎবাতেও ইসতিসকার এই দু'আ পাঠ করতেন এবং তার ফলে বৃষ্টি হতো। (বুখারী ১ম খণ্ড ১৩৭ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا*

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাস্‌কিনা, আল্লাহুম্মাস্‌কিনা আল্লাহুম্মাসকিনা আল্লাহুম্মা আগিছনা আল্লাহুম্মা আগিছনা।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ইসতিসকার জন্য দুই রাকা'আত নামায পড়তেন এবং তাঁর চাদর উল্টাতেন।

(বুখারী, মিসরী ছাপা ১ম খণ্ড ১১৬ পৃষ্ঠা)

আবূ দাউদে এসেছে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নিকট কতিপয় লোক বৃষ্টি না হওয়ার অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ঈদগাহে একটি মিম্বর স্থাপনের আদেশ দিলেন। মিম্বর

তৈরী করা হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নির্দিষ্ট দিনে লোকদিগকে ময়দানে হাজির হতে বললেন এবং তিনি নিজে পূর্বাকাশে সূর্যের কিনারা দেখা যাওয়ার সাথে সাথে মিম্বরে উঠে তাকবীর পাঠ করলেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠের পর ওয়াজ নসীহত করলেন এবং বললেন, 'হে লোক সকল আল্লাহ তোমাদিগকে দু'আ করার হুকুম করেছেন আর তিনি কবূল করবেন, অতএব তোমরা দু'আ কর।" তারপর এই দু'আ পাঠ করলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَ نَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ *

উচ্চারণ ঃ আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন, আর্ রাহমানির রাহীম, মালিকি ইয়াউমিদ্দীন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ইয়াফ'আলু মা ইউরীদ, আল্লাহুম্মা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতাল গানীও ওয়া নাহনুল ফুকারাউ, আন্যিল 'আলায়নাল গায়ছা ওয়াজ'আল মা আন্যালতা লানা কুওয়াতাওঁ ওয়া বালাগান্ ইলা হীন।

অর্থ ঃ 'সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি সকল জগতের স্রষ্টা, পরম দাতা, দয়ালু, বিচার দিনের কর্তা। হে আল্লাহ ! তুমি ধনশালী এবং আমরা ফকির; আমাদের প্রতি বৃষ্টি নাযিল কর এবং তুমি যা আমাদের জন্য নাযিল করবে তা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমাদের খাদ্য শক্তিতে পরিণত কর।' এই দু'আ পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দুই হাত এমন উঁচু করলেন যে, তাতে তাঁ দুই বগলের সাদা (ফাঁকা) অংশ দেখা যেতে লাগলো। অতঃপর তিনি মানুষের দিকে পিঠ ফিরিয়ে চাদর গায়ে দিয়ে পুনরায় দুই হাত তুলে দু'আ করলেন। পরে মিম্বর থেকে নীচে নেমে সাহাবাদের সঙ্গে দুই রাকা'আত নামায পড়লেন। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম বায়হাকী লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) গাযওয়ায়ে তাবূক থেকে ফিরে এসে মদীনার মসজিদের মিম্বরে শুক্রবার ছাড়াই দাঁড়িয়ে পানির জন্য দু'আ করেছেন। (শরহে সিফরুস্ সা'আদাত ২২৫ পৃষ্ঠা)

আবূ দাউদে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) পানির জন্য সাধারণ ভাবে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাসকিনা গায়ছান মুগীছান, মারীআন নাফি'আন গায়রা যার্‌রিন 'আজিলান গায়রা আজিলিন।

অর্থ ঃ আল্লাহ (তুমি আমাদেরকে প্রকাশমান মুষলধারা উপকারী বৃষ্টির পানি পান করাও যা অনিষ্ট ও ক্ষতিকারক নয় ; শীঘ্র, বিলম্বে নয়।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)

তিরমিযীতে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) যাওয়ার নিকটবর্তী আযহারুয যায়তের নিকটে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে পানির জন্য দু'আ করেছেন এবং দু রাকা'আত নামায পড়েছেন। (তিরমিযী (১) ৭৩ পৃষ্ঠা)

মুসলিম শরীফে এসেছে ঃ

عن انس بن مالك رضى ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء *

অর্থ ঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত–রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) পানির জন্য দু'আ করেছেন, তাতে তিনি দু হাতের পীঠ আকাশের দিকে করেছেন। (মুসলিম (১) ২৯৩ পৃষ্ঠা)

এই হাদীস গ্রন্থের অপর এক রিওয়ায়াতে আছে

عن ابن شهاب قال اخبرنى عبادبن تميم المازنى انه سمع عمه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقى فجعل الى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول ردائه ثم صلى ركعتين *

অর্থ ঃ ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত–উব্বাদ ইবনে তামীম মাযিনী আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর চাচা যিনি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সাহাবী ছিলেন তাঁর নিকট শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) একদা পানির উদ্দেশ্যে দু'আ করার জন্য বের হলেন। অতঃপর

মানুষের দিকে পীঠ করে কেবলা দিকে মুখ করে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন এবং চাদর উল্টালেন, অতঃপর দুরাকা'আত নামায পড়লেন।

(মুসলিম (১) ২৯৩ পৃষ্ঠা)

বুখারী শরীফে আছে ঃ

عن انس بن مالك رضى الله ان عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نستسقى اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون *

অর্থ ঃ আনাস ইবনি মালেক হতে বর্ণিত– উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) পানির অভাবের সময় আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ওয়াসীলা করে পানির জন্য দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আমরা পূর্বে তোমার নিকট নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর ওয়াসীলা করে পানি চাইতাম, তুমি আমাদেরকে পানি পান করাতে (দিতে), এখন আমরা নবীর চাচার ওয়সীলা করে পানির জন্য পার্থনা করছি। অতঃপর আল্লাহ তাদের পানি পান করাতেন (বৃষ্টি দিতেন)। (বুখারী (১) ১৪৭ পৃষ্ঠা)

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দু'আর মধ্যে জীবিত দীনদার পরহেযগার নেককার লোকের ওয়াসীলা করা জায়েয, কিন্তু মৃত ব্যক্তির ওছিলা করা জায়েয হবে না। যদি হতো তা হলে সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর তাঁর জীবিত চাচা আব্বাসের ওয়াসীলা না করে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর ওয়াসীলা করতেন।

অতি বৃষ্টির অভিযোগে নবীর দু'আ

সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অতি বৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি এই দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাওয়ালায়না ওয়ালা 'আলায়না আল্লাহুম্মা 'আলাল

আকামে ওয়াল জিবালে ওয়ায যিরাবে ওয়াল আওদীয়াতে ওয়া মানাবিতিশ শাজারি।

অর্থ ঃ হে আমাদের আল্লাহ ! আমাদের আশে পাশে পানি বর্ষাও, আমাদের উপর বর্ষাইও না। হে আল্লাহ ! টিলা, পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, বন-জঙ্গল, বৃক্ষ উৎপাদনের জায়গায় পানি বর্ষণ করাও। (বুখারী (১) ১৩৭ পৃষ্ঠা)

ইসতিসকার নামাযে তাকবীর সংখ্যা হচ্ছে শাফী মাযহাবের মতে ঈদের নামাযের তাকবীরের অনুরূপ অর্থাৎ ১২ তাকবীর। তবে এই মর্মে তারা যে হাদীস পেশ করে থাকেন তা প্রামাণ্য নয়, বরং সহীহ হাদীসে যা আছে আমরা তাই উল্লেখ করলাম অর্থাৎ সাধারণতঃ নামাযের তাকবীরের মত তাকবীর দিতে হবে।

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামায

চন্দ্র কিংবা সূর্য গ্রহণ লাগলে গ্রাম বা মহল্লার মুক্তাদীদেরকে সংবাদ দিয়ে মসজিদে একত্রিত করে তাদের সহ ইমাম সাহেব দুই রাকা'আত নামায পড়বেন−প্রত্যেক রাকা'আতে দুই হতে পাঁচটি পর্যন্ত রুকু করা জায়িয। এই নামাযে প্রকাশ্য কিরায়াত করবে এবং এই নামাযের জন্য লোকদেরকে−

الصلوة جامعة

'আস্‌সালাতু জামে'আতুন' বলে ডাকা জায়িয। দুই রাকা'আত নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পড়ার পর রুকু করবে। রুকু থেকে মাথা তুলে পুনরায় তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে সূরা ফাতিহা এবং অপর একটি সূরা পড়ে রুকুতে যাবে। রুকু থেকে উঠে আবার তাকবীরে তাহ্‌রীমা বেঁধে সূরা ফাতিহা এবং অপর সূরা পড়ে অতঃপর রুকু সিজদা করবে। এইভাবে প্রত্যেক রাকা'আতে দুই হতে পাঁচটি রুকু করে দুই রাকা'আত নামায আদায় করবে। নামাযের পর ইমাম সাহেব মুক্তাদীদের খুৎবা শুনাবেন। যতক্ষণ গ্রহণ না ছুটে ততক্ষণ দু'আ, খুৎবা ও নামাযের মধ্যে কাটাবে।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)

গ্রহণের নামাযে ১ম রাকা'আতে সূরা আনকাবূত ও ২য় রাকা'আতে সূরা রূম পাঠ করা উচিত এবং গ্রহণের সময় দান খয়রাত করা কর্তব্য। (আবু দাউদ)

ভূমিকম্পের নামায

ভূমিকম্প আল্লাহর আযাব ও আজমায়িশ; অতএব তখন আল্লাহর নিকট কাঁদাকাটা করা এবং নামায পড়া দরকার। ভূমিকম্পের সময় ছয় রুকূতে চার সিজদায় দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নাত (অর্থাৎ তিন রুকুর পর দুই সিজদা এই ভাবে চার সিজদা)। (বায়হাকী ২য় খণ্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সালাতুত্ তাসবীহ বা তাসবীহের নামায

সালাতুত্ তাসবীহ সম্বন্ধে হাদীসে এসেছে; রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি এ নামায পড়বে তার জানা-অজানা, আগে-পিছের, জাহেরী, পুশিদা, ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তিনি আরও বলেছেন; যদি পার প্রত্যহ একবার, নতুবা প্রতি সপ্তাহে একবার, যদি তাও না পার তবে মাসে একবার, অগত্যা বছরে একবার, অন্ততঃ সারা জীবনে কমপক্ষে একবার এই নামায পড়বে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

সালাতুত তাসবীহ পড়ার তারতীব

চার রাকা'আত নামাযের নীয়ত করে দাঁড়াবে, অনন্তর সানা পাঠের পর সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ শেষ করে দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার এই তসবীহ পাঠ করবে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ*

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর জন্য পবিত্রতা, আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নাই, আল্লাহ মহান।

তারপর রুকুতে যাবে, রুকুর দু'আ পাঠ শেষে এই তাসবীহ ১০ বার পড়বে–রুকু থেকে দাঁড়িয়ে খাড়া অবস্থায় ১০বার, তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদার দু'আ পাঠ শেষে ১০ বার, এক সিজদা করে বসে ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদায় ১০বার, দ্বিতীয় সিজদার পর বসে ১০ বার, এই ভাবে এক রাকা'আতে ৭৫ বার হলো। এইরূপে চার রাকা'আতে মোট ৭৫×৪=৩০০ (তিনশত) বার–এই তসবীহ পড়বে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

সালাতুল আউওয়াবীন

মাগরিবের ৩ রাকা'আত ফরয ও ২ রাকা'আত সুন্নাত নামায শেষ করে ছয় রাকা'আত নামায পড়া খুব সওয়াবের কাজ। এই নামাযের নাম সালাতুল আউয়াবীন।

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকা'আত নফল নামায পড়বে তার আমল নামায় ১২ বৎসর নফল ইবাদতের সমতুল্য সওয়াব লিখা হবে। (ইবনে মাজাহ (১) ৮৩ পৃষ্ঠা, তিরমিযী (১) ৫৮ পৃষ্ঠা, আততারগীব ওয়াত তারহীব (১) ১০৩ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ (১) ৫০২ পৃষ্ঠা।)

হাজতের নামায

রোগমুক্তি বা অন্য কোন বিশেষ হাজতের (প্রয়োজন) জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, দুই রাকা'আত নামায পড়ে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে, যথাশীঘ্র, আল্লাহ তার হাজত পূর্ণ করবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ (ص) نَبِىِّ الرَّحْمَةِ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِهٖ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ فَتَقْضِىْ وَتُشَفِّعُنِىْ فِيْهِ وَ تُشَفِّعُهُ فِىَّ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ওয়া আতাওজ্জাহু ইলাইকা বিনাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন নাবীউর রাহমাতি ইন্নী আতাওয়াজ্জাহু বিহী ইলা রাব্বী ফি হাজাতী হাযিহি ফাতাকযী ওয়া তুশাফফেউনী ফীহি ওয়া তুশাফাফ'হু ফিইয়্যা। (আহমদ, (৪) ১৩৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী (২) ১৯৭ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ১০০ পৃষ্ঠা, হাকিম (১) ৫১৯ পৃষ্ঠা, আততারগীব (১) ২২৫ পৃষ্ঠা।)

অভাব মোচনের নামায

মানুষের অভাব দুই প্রকার। কতকগুলি অভাব এমন যা কোন লোকে দ্বারা মোচন করা সম্ভব নয়। যেমন হঠাৎ কোন বিপদ-আপদে আক্রান্ত হওয়া কিংবা দুরারোগ্য রোগে ব্যাধি গ্রস্তহওয়া। ২য় প্রকার, যা মানুষের দ্বারা মোচন হয়ে থাকে। যেমন টাকা-পয়সা বা কোন জিনিসপত্রের অভাব ইত্যাদি। উভয়

অবস্থাতে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি মিসওয়াক ও অযু করে দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে; ইনশা আল্লাহ তার অভাব মোচন হবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল 'আরশিল 'আযীম ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামিন, আস্‌আলুকা মূজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া 'আযায়িমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লি বির্‌রিন ওয়াস্‌সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন লা তাদা'লি যামবান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিযান ইল্লা কাযাইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি ধৈর্যশীল, মর্যাদাবান। সেই আল্লাহ তা'আলা পূত যিনি মহান আরশের অধিপতি। আর সমস্ত প্রশংসা তার যিনি সমুদয় সৃষ্ট জগতের প্রভু প্রতিপালক। হে প্রভু! আপনার যে রহমত আমার জন্য অবশ্যম্ভাবী হয় তাই প্রার্থনা করছি আর চাইতেছি আপনার সুনিশ্চিত মার্জনা আর আমি কামনা করি প্রত্যেক নেকীর গনীমত এবং প্রত্যেক পাপ থেকে নিরাপত্তা। আপনি মাফ না করে কোন গোনাহ ছেড়ে দিবেন না এবং কোন চিন্তা দূর না করে রেখে দিবেন না এবং আপনার সন্তোষপ্রাপ্ত কোন প্রয়োজনকে অপূর্ণ রাখবেন না। (তিরমিযী (১) ৬৩ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ১০০ পৃষ্ঠা)

আলহামদুলিল্লাহ

২য় খণ্ড সমাপ্ত

সহীহ্ নামায

ও

দু'আ শিক্ষা

যুদ্ধের ময়দানে নামায

হাদীসে যুদ্ধের ময়দানে নামায পড়ার চৌদ্দ প্রকার নিয়মের কথা বর্ণিত হয়েছে। (আবূ দাউদ (১) ৪৭৭ পৃষ্ঠা, মুহাল্লা (৫) ৩৩ পৃষ্ঠা, যাদুল মা'আদ (২) ৯২ পৃষ্ঠা, আরিযাতুল আহওয়াযী (২) ২৯৭ পৃষ্ঠা)

এখানে মাত্র ৫টি অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

প্রথমঃ মুসলিম সৈন্যদেরকে ইমাম সাহেব দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগকে সশস্ত্র অবস্থায় শত্রুর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখবেন এবং অপর দলকে সঙ্গে নিয়ে এক রাকা'আত নামায পড়বেন। এক দল গিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়ালে দ্বিতীয় দল এসে ইমামের সাথে এক রাকা'আত নামায পড়ে শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে। প্রথম দল এসে প্রত্যেকে নিজ নিজ অবশিষ্ট নামায আদায় করে নিবে, এদের চলে যাওয়ার পর ২য় দল এসে অবশিষ্ট নিজ নিজ নামায পড়ে নিবে।

দ্বিতীয়ঃ শত্রুর পক্ষ থেকে আশঙ্কার কারণ থাকলে এবং এইভাবে নামায জামা'আতের সাথে পড়তে না পারলে সৈন্যগণ যে যেখানে থাকবে সেখানেই দাঁড়িয়ে ইশারার সাথে রুকু সেজদা করে নিবে।

তৃতীয়ঃ ভয়ের মাত্রা বেশী হলে হেঁটে হেঁটে ইশারায় নামায পড়বে। (বুখারী)

চতুর্থঃ ভয়ের মাত্রা আরো অধিক হলে জানোয়ার বা অন্য যান-বাহনের উপর বসে বসে কেবলা মুখী হয়ে নামায পড়বে।

পঞ্চমঃ ভয়ের মাত্রা অত্যধিক বেশী হলে এবং পরিস্থিতি মারাত্মক হলে জানোয়ারের পীঠে অথবা যানবাহনে বসে যেদিকেই থাক না কেন শুধু নামাযের নিয়ত করে ইশারার সাথে পড়বে। (মুয়াত্তা মালেক, বুখারী, মুসলিম)

নৌকায় নামায

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নৌকায় নামায পড়া সম্বন্ধে ফরমিছেন, (নামাযীর উঠা বসা ও নড়া-চড়ার ফলে) নৌকা যদি ডুববার ভয় না থাকে তা হলে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে আর ডুববার আশঙ্কা হলে বসে নামায পড়বে। (দারকুতনী (১) ১৫১ পৃষ্ঠা)

এটা হলো নৌকা স্থির এবং কিবলা ঠিক থাকার সময়ের কথা। কিন্তু

আরম্ভের পর যদি নৌকা এদিক ওদিক ঘুরে যাওয়ার ফলে কিবলা ঠিক না থাকে তবে নামায হবে না। তবে ঐ অবস্থায় যদি সামান্য ঘুরে ফিরে দাঁড়ালেই কেবলা ঠিক রাখা যায় তা হলে তাই করবে, অ ন্যথায় নামায জমা করবে। আর জমা যোহর আসর একসঙ্গে আসরের ওয়াক্তে এবং মাগরিব এশা এক সঙ্গে এশার সময়ে পড়বে। কিন্তু ফজর অন্য কোন নামাযের সাথে জমা করবে না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নৌকায় নামায বসে বসে পড়বে।
(নসবুর রায়া ১/১৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রাণীর পিঠে নামায

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নিজে জানোয়ারের পিঠে নফল নামায পড়তেন। প্রথমে কেবলা ঠিক করে শুরু করতেন তারপর সওয়ারী যে কোন দিক গেলেও তিনি ঐ অবস্থায় নামায পড়তেন।
(বুখারী (১) ১৪৮ পৃঃ, মুসলিম (১) ২৪৪ পৃঃ)

তবে ফরয নামাযেও কিবলা দিক হয়ে পড়া খুব অসুবিধা জনক হলে (যেমন, প্রবল ঝড় বাতাস, বারিপাত অথবা শত্রুর ভয় ইত্যাদি অবস্থায়) প্রাণীর পিঠে যে কোন দিক হয়ে ফরয নামায আদায় করা যাবে। তবে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ অসুবিধা না হলে ঐভাবে নামায পড়া চলবে না। (তিরমিযী (১) ৫৫ পৃঃ; মাজমাউল বেহার (১) ১৬১ পৃঃ; তালখীসুল হাবীর (১) ৭৯ পৃঃ; তাহযীব (৮) ৮৯ পৃঃ)।

বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ও রেলগাড়ীতে নামায

রেলগাড়ী সহ বিভিন্ন প্রকার যানবাহনে নামায পড়তে বিশেষ অসুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। আর খুব বেশী রকম অসুবিধা হলে বসে পড়া চলবে। (আত্তা'লীকুল মুগনী শরহে দারকুতনী (১) ১৫২ পৃঃ)

তবে (যান বাহনে উঠবার পূর্বে) দুই নামায জমা করে দাঁড়িয়ে এবং কেবলা দিক ঠিক রেখে পড়ার সুযোগ থাকলে জমা করবে, সে সুযোগ না থাকলে ওয়াক্তের নামায ওয়াক্ত মতে অসুবিধাজনক যানবাহনে অগত্যা বসে পড়বে।

নৌকায় এবং গাড়ীতে যেরকম নামায পড়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে উড়োজাহাজেও তদ্রুপ পড়তে হবে। অর্থাৎ দাঁড়িয়ে অসুবিধা হলে বসে পড়বে আর কেবলা মোটেই ঠিক রাখা না গেলে জমা করবে এবং জমার সময়েও প্লেন

চললে অর্থাৎ দুই নামায একত্র জমা করার সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রতি নামায ওয়াক্ত মত যে কোন দিক হয়েই পড়বে।

এস্তেখারার নামায

কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সংকল্প করলে সে কাজের ভাল মন্দ জানার জন্য যথা কাজ করা বা না করা, কোথাও যাওয়া বা না যাওয়া, বিবাহ শাদী করা, না করা, দেওয়া, না দেওয়া, চাকরী স্থলে যাওয়া, না-যাওয়া, দোকান ইত্যাদি দেওয়া, না-দেওয়া, নতুন বাড়ী করা, না-করা। এ ধরনের বহুবিধ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে শুভাশুভ জানার জন্য ইস্তেখারার নামায পড়া সুন্নাত। (বুখারী, তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ইস্তেখারার দু'আ তাঁর সাহাবাগণকে কুরআনের সূরার মত শিক্ষা দিতেন এবং শিক্ষা করার জন্য তাকীদ করতেন, ইস্তেখারা করলে মুমেন লোক কখনও নিরাশ বা লজ্জিত হয় না কোন ব্যাপারে ইস্তেখারা একবার করে কোন কিছু জানতে না পারলে ক্রমাগত ভাবে তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত করতে হবে, এর পরও পরিষ্কার কিছু বুঝতে না পারলে আমলকারীর নিজ মন যে দিকে ধাবিত হবে সেটাই করবে।

(ইবনে সুন্নী; নায়লুল আওতার, ৩য় খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

ইস্তেখারাহ পড়ার নিয়ম

প্রথমে মেসওয়াক করতঃ ওযু করে দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ে ইস্তেখারার দো'আয় পাঠ করবে।

আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নের ভিতর অথবা তন্দ্রার মাঝে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিবেন। সেই স্বপ্নের কথা অথবা অবস্থার ইঙ্গিত সহজে বুঝতে না পারলে হাক্কানী আলেমের নিকট তার তা'বীর জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে।

ইস্তেখারার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ

فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ- اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَفِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ- وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّلِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَفِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখিরুকা বিইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আস্ আলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম.; ফা ইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌রা (হাযাল আম্‌রা বলার সময় নিজের প্রার্থিত বস্তুর নাম করবে) খায়রুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আকিবাতি আমরী ওয়া ফী 'আজিলি আম্‌রী ওয়া আজিলিহি ফাকদিরহু লী ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী ছুম্মা বারিকলী ফীহ, ওয়া ইন্ কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌রা (এখানেও পুনরায় প্রার্থিত বস্তুর নাম করবে) শাররুল লী ফী দীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আকিবাতি আম্‌রী ওয়া ফী 'আজিলি আম্‌রী ওয়া আজিলিহি ফাছরিফ্‌হু 'আন্নী ওয়াছরিফ্‌নী 'আন্‌হু ওয়াকদির লিয়াল খায়রা হায়ছু কানা ছুম্মারযিনী বিহ।

অর্থঃ প্রভু হে! আমি তোমার জ্ঞানের ওছিলায় তোমার কল্যাণ কামনা করিতেছি; তোমার কুদরতের ওসিলায় শক্তি চাহিতেছি আর তোমার অপার করুণা ভিক্ষা করিতেছি। কারণ তুমিই সর্ব শক্তিমান আর আমি দুর্বল। তুমি জ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ এবং তুমিই সর্বজ্ঞাতা। প্রভু হে ! তুমি যদি মনে কর যে, এই কাজটি (অভিষ্ট বস্তু) আমার দ্বীন ও দুনিয়ায়, ইহকালে ও পরকালে আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে তা হলে আমার জন্য উহা নির্ধারিত করে দাও এবং উহার প্রাপ্তি আমার জন্য সহজতর করে দাও। অতঃপর তুমি উহাতে (আমার কাজে) বরকত দাও। আর যদি তুমি মনে কর এই জিনিষটি (অভিষ্ট বস্তু) আমার দ্বীন ও

দুনিয়ায় ইহকালে ও পরকালে আমার জন্য ক্ষতিকর হবে তা হলে তুমি উহাকে আমা হতে দূর করে দাও এবং আমাকে উহা হতে দূরে রাখো; অতঃপর তুমি আমার জন্য যাহা মঙ্গলজনক তাহা ব্যবস্থা কর– সেটা যেখান থেকেই হোক না কেন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করে তোল ।

(বুখারী ১ম খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ১ম খণ্ড ১৯০ পৃষ্ঠা)

এতেকাফ

রামাযানের ২০ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত মসজিদে বসে বসে ইবাদত করাকে এতেকাফ বলে। এ'তেকাফ অবশ্য মসজিদেই করতে হবে।

(বুখারী ১ম খণ্ড ঃ ২২০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করতেন। (বুখারী (১) ২২০ পৃষ্ঠা)

এ'তেকাফের জন্য রামাযানের ২০ তারিখে ফজরের নামায পড়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে বসবে (বুখারী) এবং ঈদের দিন মসজিদ থেকে বের হয়ে ঈদগাহে গিয়ে নামায পড়ে বাড়ী ফিরবে।

মেয়েদের এতেকাফ

মেয়েরাও এতেকাফ করতে পারে (বুখারী)। নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থা থাকলে মসজিদেই এতেকাফ করবে (বুখারী)। ওয়াক্তিয়া মসজিদ বা নিরাপদ নামায ও ইবাদতের জায়গায় বসেও মেয়েরা এতেকাফ করতে পারে।

(ফতহুল বারী (৪) ১৯৩ পৃষ্ঠা)

তাওবার নামায

মানুষ যে কোন মুহূর্তে পাপ কাজ করতে পারে, কারণ শয়তান সদা সর্বদা মানুষকে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) দিয়ে থাকে। আরবীতে প্রবাদ বাক্য আছে,

অর্থাৎ "ভুল ত্রুটি মানুষের সহজাত" الانسان مركب من الخطا والنسيان*

আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে– বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, কোন ব্যক্তি হঠাৎ কোন পাপ করে ফেললে সে ওযু করে দুই রাকা'আত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট তাওবা এস্তেগফার করলে অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাইলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

والذين اذا فعلوا فاحشة اوظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلواد وهم يعلمون *

অর্থঃ এবং যাহারা এমন যে, যখন কোন ফাহেশা কাজ করিয়া বসে অথবা (কোন সাগীরা গুনাহ করিয়া) নিজেদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া ফেলে তখন তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করতঃ নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে – আর আল্লাহ ছাড়া কেই বা ক্ষমা করতে পারে এবং ইহা হৃদয়ঙ্গম করার পরে তারা পূর্বে যে পাপ কাজ করে ফেলছে, তাহা আবার করিতে জিদ ধরে না।

| তিরমিযী ২য় খণ্ড, ২২৫ পৃঃ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী, তারগীব ওয়াত তারহীব (১ম) খণ্ড ২০৭ পৃঃ)

কাজেই হঠাৎ কোন পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে সালাতুত তাওবা বা তৌবার নামায পড়ে তাওবা করা উচিত।

রোগী দেখার দু'আ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, কেউ কোন রোগীর নিকট গেলে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে এবং সম্ভব হলে তার শরীর ডান হাত দ্বারা আমর্শন করবে (মলে দিবে)। দু'আটি এইঃ

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا*

উচ্চারণ ঃ আয্হিবিল বাআসা, রাব্বান্নাসি, ওয়াশফি আনতাশ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা য়ুগাদিরু সাকামা।

অর্থঃ হে মানুষের প্রভু! তুমি কষ্ট দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই একমাত্র আরোগ্যদানকারী, তুমি ভিন্ন আরোগ্যদাতা নেই, এমন আরোগ্য কর যে কোন অসুস্থতা থাকেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

নিম্নলিখিত দু'আও পাঠ করা যেতে পারে ঃ

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

উচ্চারণ ঃ আসআলুল্লাহাল আযীম, রাব্বিল আরশিল আযীম আঁই ইয়াশফীকা।

অর্থঃ আরশের অধীশ্বর মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিকে لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র তালকীন দিবে।

(আবু দাউদ, তিরিমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

ইমাম শওকানী রেওয়ায়েত করেছেন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ "আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ" এর তালকীন দিবে। (দুরারে মুযীয়াহ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও ফরমিয়েছেন, তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সূরা ইয়াসীন এর তালকীন দিবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উত্তর শির করে শোয়াবে এবং তার নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করতে থাকবে। তাতে রোগীর জাঁ-কান্দানী কষ্ট হালকা হবে।

(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

অতঃপর হাত পা সোজা করে দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একখানা পাক সাফ কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। (বুখারী, মুসলিম)

মৃত ব্যক্তির ঋণ ও মোহরানা

মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকলে তার ওয়ারীসগণ আদায় করবে। কারণ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মৃতের আত্মা আটক থাকে।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ, নাইলুল আওতার)

কেউ যদি স্ত্রীর মোহরানা আদায় না করে মারা যায় সেটাও ঋণের মধ্যে গণ্য হবে। স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে উক্ত ঋণ শোধ করতে হবে। স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় মাফ দেয় তবে সে অশেষ সওয়াবের ভাগী হবে। স্ত্রীর নিকট থেকে জবরদস্তী মোহরানা মাফ লওয়া দুরস্ত নয়।

মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না কাটি করা

কোন মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে ঃ- اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

উচ্চারণঃ- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই দু'আ পাঠ করবে। (ইবনে মাজাহ, আহমদ)

অর্থঃ আমরা সকলে আল্লাহর জন্য এবং আমরা সকলেই তাঁর নিকট ফিরে যাব। (সূরা বাকারাহ আয়াত ১৫৬)

আপন লোকজন মারা গেলে ইন্না লিল্লাহে এর সাথে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে। ﴿ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আজিরনী ফি মুছীবাতী ওয়াখলুফ লী খাইরাম মিনহা। (মুসলিম)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে এই মুছীবতে রক্ষা কর এবং এর উৎকৃষ্ট স্থলাভিষিক্ত দান কর।

মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কাঁদা এবং বিলাপ করা নিষেধ। তাতে মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হয়ে থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে যদি উক্ত ব্যক্তি কাঁদতে নিষেধ করে থাকে তাহলে তার উপর আযাব হবে না। যারা কাঁদে তাদেরই গুনাহ হবে। মৃত ব্যক্তির জন্য চুপে চুপে কাঁদা ও নীরবে অশ্রুপাত করাতে নিষেধ নেই। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

শিশু সন্তানদের শাফা'আত

সহীহ হাদীসে এসেছে যদি কারো তিনটি শিশু সন্তান মারা যায় আর তাদের পিতামাতা (নাম রেখে আকীকা দেয়) ও কাঁদা কাটা না করে ধৈর্য্য ধারণ করে তবে আল্লাহ তায়ালা উক্ত সন্তানগণকে বেহেশ্তী করবেন এবং ঐ

ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাপ-মাকে শাফা'আত করে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাবে।
(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজ্জাহ, আহমদ, তাবরানী)

অনুরূপ ২/১টি সন্তান মারা গলেও সেই রকম ফল পাবে।
(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

মাইয়েতকে গোসল দেওয়া

একমাত্র প্রকৃত শহীদ ব্যতীত সকল প্রকার মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ফরযে কেফায়াহ। আদম (আঃ) থেকেই এই প্রথা চলে আসছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, আদমের (আঃ) মৃত্যুর পর ফেরেশ্‌তাগণ তাঁকে পানি দ্বারা বেজোড় সংখ্যায় ধৌত করেন অতঃপর দাফন করেন [মির আতুল মাফাতীহ (২) ৪৫৯ পৃষ্ঠা]

মৃত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত নিয়মে গোসল দিতে হয়।

১। একটা তক্তা, চৌকী কিংবা ঐ জাতীয় কোন কিছুর উপর রেখে মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ঢেকে অতঃপর পরিধেয় কাপড় সাবধানে খুলবে।

২। একখানা কাপড়ের ন্যাকড়া দ্বারা লজ্জাস্থান পরিষ্কার করবে

৩। অতঃপর নামাযের ন্যায় ওযু করাবে।

৪। গোসল দেওয়ার পূর্বে মাথার চুল ও দাড়ী সাবান দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কার করে নিবে। (আবূদাউদ)

৫। কুলের পাতা দ্বারা (বা সাবান লাগিয়ে) গোসল দিবে। (বুখারী-মুসলিম)

৬। মৃত দেহকে বাম কাতে শোয়ায়ে ডান পার্শ্ব হতে পানি ঢেলে দিয়ে গোসল করাবে।

৭। শেষ বারের পানিতে কর্পূর মিশাবে (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

৮। পার্শ্ব পরিবর্তন কালে অত্যন্ত কোমল হস্তে ধরবে, যেন চাপে নাপাকী বাহির না হয়।

৯। আস্তে আস্তে সারা শরীর উত্তমরূপে মর্দন করে গোসল দিবে যেন শরীরের কোন অংশ শুকনা না থাকে।

১০। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, গোসল সাধারণতঃ মৃতের নিকট-আত্মীয় দিবে, তবে তাদের গোসল দিবার নিয়ম

ভালভাবে জানা না থাকলে অন্য কোন জানাশুনা লোক এবং মুত্তাকী পরহেজগার লোক গোসল দিবে। (আহমদ)

মৃত স্বামী অথবা স্ত্রী কর্তৃক একে অপরের গোসল দেয়া

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব স্বামী মৃতা স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী মৃত স্বামীকে গোসল দিতে পারে না, এমন কি একে অপরের চেহারা দেখতে পারে না। ইহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক কথা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। নবীর হাদীসের আনুকূল্যে এবং জীবনের মধুর সম্পর্কের কথা মনে করে যুক্তি বুদ্ধি এবং মানবতার খাতিরেও স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গোসল দেওয়াই সর্বদিক দিয়ে উচিত এবং ন্যায়সঙ্গত।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় স্ত্রী আয়িশা সিদ্দীকাকে (রাঃ) প্রায়ই বলতেন,

يا عائشة لومت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك *

অর্থ ঃ হে আয়িশা! তুমি যদি আমার আগে মারা যাও, তাহলে আমি তোমার নিকট থাকব, তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব, তোমার প্রতি জানাযার নামায পড়াব এবং তোমাকে দাফন করবো।

(ইবনে মাজাহ ১০৭ পৃঃ, ইবনে হিব্বান, আহমাদ, দারকুতনী)

পাঠকা পাঠিকা ভাই বোনেরা নবীর এরূপ হাদীসটির প্রতি খেয়াল করবেন। সহীহ হাদীসে আরও এসেছে মৃত্যুর পর স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারে। (আবূ দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ)

ইসলাম জগতের প্রথম খলিফা নবীর সারা জীবনের প্রাণের সাথী আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) স্ত্রী আছমা (রাঃ) স্বীয় স্বামী আবূ বকর সিদ্দীককে তাঁর মৃত্যুর পর গোসল দিয়েছিলেন।

(দারকুতনী, তালখীছুল হাবীর, মুয়াত্তা মালেক, ৭৭ পৃঃ আসরারুস সুনানে ১১৮ পৃঃ)।

ইসলাম জগতের ৪র্থ খলিফা মহানবীর জামাতা "শেরে খোদা" আলী

(রাঃ) স্বীয় স্ত্রী নবীর কন্যা ফাতেমাকে (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর পর গোসল দিয়েছিলেন। দারকুতনী, ১৯৪ পৃষ্ঠা, বায়হাকী (৩) ৩৯৬ পৃষ্ঠা।

উপরোল্লেখিত হাদীস ও ঘটনা সমূহ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষে একে অপরকে মৃত্যুর গোসল দিতে কোন প্রকার অসুবিধা বা বাধা বিপত্তি নাই। কেউ আপত্তি করলে তা হবে স্পষ্টতঃই হাদীসের খেলাফ।

কোন কোন মাযহাবে নাকি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে "নিকাহ" টুটে যায়। অতএব স্বামী স্ত্রী একে অপরকে গোসল দেওয়া দূরে থাক, দেখাও করতে পারে না। এখানে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, মৃত্যুতে যদি সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কেন আয়িশা (রাঃ) কে মৃত্যুর পর, গোসল করাতে, কাফন পরাতে চাইলেন? আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কোলে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তিকালের পরও তিনি সেখানে ছিলেন। এ কেমন করে সম্ভব হলো? আর আবূ বকরকে তাঁর বিবি আছমা এবং ফাতেমা (রাঃ) কে তাঁর স্বামী আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু মৃত্যুর পর কেমন করে ধোয়ালেন? তাদের কি এ মাসআলা জানা ছিল না? আরো প্রশ্ন জাগে তারা কি বিশ্ব মুসলিম সমাজের আদর্শ নন। মৃত্যুর পর যদি স্বামী স্ত্রী সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে যায় তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে কেন ৪ মাস দশদিন শোক প্রকাশ করতে হয়। আর সম্পর্কই যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে স্বামী-স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে কেন ওয়ারীস হয়ে থাকে? কাজেই এই মাসআলার ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকা ভাই বোনদেরকে ইনসাফের সাথে বিচার করতে ও ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবে- গোসল দেওয়ার পর তার পক্ষে গোসল করা মোস্তাহাব। (তালখিসুল হাবীব, বায়হাকী)

কাফনের কাপড়

মাইয়েত যদি পুরুষ হয় তবে ৩ কাপড় দিবে- (১) ইযার (২) চাদর (৩) লেফাফা। কামীছ, কুরতা বা পাগড়ী লাগবে না।
(বুখারী (১) ১৬৯ পৃঃ, মুসলিম (১) ৩০৬ পৃঃ, বায়হাকী (৩) ৪০৫ পৃঃ, হাকিম (১) ৩৫৫ পৃষ্ঠা)।

আর যদি ৩ কাপড় দেওয়ার সংগতি না থাকে তাহলে অগত্যা এক

কাপড়েও চলবে (মোয়াত্তা মালেক, ১২৯ পৃষ্ঠা)। মৃত ব্যক্তি যদি সম্পত্তি না রেখে যায় তবে দুই বা এক কাপড়েও দেওয়া যেতে পারে। (মুসলিম)

বদর যুদ্ধে শহীদ মুছআব ইবনে ওমায়েরের কাফনের জন্য শুধু এমন একটা কাপড় ছিল যদ্বারা মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা আলগা হয়ে যেত। তখন জনাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ মত অবশেষে তার মাথা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল এবং পায়ের উপর "এযখর" নামক ঘাস দেয়া হয়েছিল। [বুখারী (১) ১৭০ পৃষ্ঠা]

মাইয়েত যদি স্ত্রীলোক হয় তবে তার ৫ কাপড় লাগবে।

১। সিনাবন্দ। ২। ইযার বা লুঙ্গী। ৩। খিলকা বা কোর্তা। ৪। উড়নী।

৫। লেফাফা, মাথা হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত।

(আহমদ, আবূ দাউদ, মুন্তাকাল আখবার)।

কাফনের রং সাদা এবং পাক সাফ হওয়া চাই। কিন্তু বেশী মূল্যবান হওয়া নিষেধ। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

পুরাতন ও ব্যবহার করা কাপড় দ্বারাও কাফন দেওয়া দুরস্ত আছে। (বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)।

অসমর্থ হলে মহিলাদের জন্য ইযার, কোর্তা ও লেফাফা এই তিনটিতেও চলবে।

মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হলে কাফন পরাবার পূর্বে তাঁর মাথার চুলগুলি তিনভাগে বিভক্ত করে বেণী তৈরী করবে। সম্মুখে চুলের একটি এবং দুই পার্শ্বের চুল দ্বারা দুইটি। বেণীগুলি পিছনের দিকে রেখে দিবে। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

পুরুষের কাফন পরাবার পূর্বে মাথা এবং দাড়ীতে আতর লাগাবে এবং কাফন পরাবার পর স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কাফনে সেজদার স্থানগুলিতে যথা উভয় হাতের তালু, নাক, কপাল, উভয় হাঁটু, উভয় পায়ের আগায় কর্পূর মেখে দিবে। (ইবনে শায়বা, বায়হাকী)

জানাযার নামায

জানাযার নামায ফরযে-কেফায়া। হিজরী সালের প্রথম বর্ষে মদীনায় জানাযার নামায যথারীতি শুরু হয়। এর পূর্বে মক্কাতে জানাযার নামাযের বিধান ছিল না। [মিরকাতুল মাফাতীহ (২) ৪০৬ পৃষ্ঠা]

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত –রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে মুসলমানের জানাযায় একশত জন দীনদার মুসল্লী শরীক হয় এবং তার জন্য দু'আ করে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে থাকেন।

(মুসলিম (১) ৩০৮ পৃষ্ঠা)

অপর এক হাদীসে এসেছে চল্লিশজন মুত্তাকী লোক যার জানাযা পড়বে তারও গুনাহ মাফ হয়, (মুসলিম (১) ৩০৮ পৃষ্ঠা)

আর এক হাদীসে পাওয়া যায় বড় বড় তিন কাতার লোক যার জানাযা পড়ে তারও মুক্তি লাভ হয়, [আবু দাউদ (২) ১৭৪ পৃষ্ঠা, হাকিম (১) ৩৬২ পৃষ্ঠা]

জানাযার নামাযের জন্য মৃত ব্যক্তিকে তক্তা বা খাটিয়ার উপর উত্তর দিকে মাথা করে রাখবে, অতঃপর ইমাম ওযুর সাথে দাঁড়াইবে। **মাইয়্যিত পুরুষ হলে ইমাম তার মাথা বরাবর এবং স্ত্রীলোক হলে তার কোমার বরাবর দাঁড়াবে।**

[বুখারী (১) ১১৭ পৃঃ, মুসলিম (১) ৩৯ পৃঃ, তিরমিযী (১) ১২৩ পৃঃ, আহমদ (৩) ২০৪ পৃষ্ঠা]

মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে কমপক্ষে তিন কাতারে দাঁড়াবে,

[আবূ দাউদ (২) ১৭৪ হাকিম (১) ৩৬২ পৃষ্ঠা]

অতঃপর ইমাম আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিয়ে দুই হাত কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত উঠায়ে বুকের উপর হাত বেঁধে নামায শুরু করবে এবং প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফউল ইয়াদায়েন করবে। (দারকুতনী, জুযয়ে রাফউল ইয়াদান)

হাত বাঁধার পর সানা পড়বে, অতঃপর প্রকাশ্য অর্থাৎ আওয়াজের সাথে সূরা ফাতেহা এবং অপর একটি সূরা পাঠ করবে ।

[বুখারী (১) ১৭৮ পৃঃ, নাসায়ী (১) ১৭৯ পৃষ্ঠা]

অতঃপর আল্লাহ আকবার বলে **২য় তাকবীর** দিয়ে দরূদে ইবরাহীম বা নামাযের দরুদ শেষ পর্যন্ত **১**বার পাঠ করবে।

অতঃপর ৩য় তাকবীর দিয়ে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا

وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا-اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ- وَمَنْ

تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهُ*

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা, আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান; আল্লাহুম্মা লা তাহরিম্না আজরাহু ওয়ালা তাফ্তিন্না বা'দাহু।

অর্থঃ হে প্রভু! জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারী– আমাদের সকলকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! যাদেরকে তুমি পৃথিবীতে জীবিত রাখবে তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রেখো এবং যাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবে তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে মা'বুদ! আমাদের ওর সওয়াব হতে বঞ্চিত করো না এবং তার মৃত্যুর পর বিপদে ফেলোনা। [নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক]

তৃতীয় তকবীরের পর নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করা জায়িয

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ- وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ*

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ওয়া 'আফিহী ওয়া'ফু আন্হু ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াছছি' মাদখালাহু ওয়াগসিলহু বিল মায়ি ওয়াছ্ছালজি ওয়াল বারাদি ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাতায়া কামা নাক্কাইতাছ্ ছাওবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাছে ওয়া আবদিলহু দারান খায়রাম মিন দারিহী ওয়া আহলান খাইরান মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহী ওয়া আদখিল্হুল জান্নাতা ওয়া ইয়্হু মিন ফিতনাতিল কবরে ওয়া আযাবিন্নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি অনুগ্রহ কর, তাকে সম্মানজনক আতিথ্য দান কর। তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার পাপরাশী পানি, শিলা এবং বরফ দ্বারা বিধৌতের ন্যায় ধৌত করে দাও এবং তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত কর যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। তাকে দুনিয়ার বাড়ী থেকে উত্তম বাড়ী প্রদান কর এবং এখানকার সঙ্গিনীর চেয়ে উত্তম সঙ্গিনী প্রদান কর এবং তাকে জান্নাতবাসী কর এবং কবরের বিপদ ও জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি দান কর। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হিছনে হাছীন)

তৃতীয় তাকবীরের পর নিম্নলিখিত দু'আও পাঠ করা জায়িয।

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলান ইবনু ফুলান (মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে ফুলান ইবনু ফুলান এর স্থলে পুরুষের নাম ও তার পিতার নাম আর মৃত ব্যক্তি নারী হলে ফুলান বিন্‌তি ফুলান এর স্থলে মৃতার নাম ও তার পিতার নাম বলতে হবে) ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জাওয়ারিকা ফাকিহি মিন ফিতনাতিল ক্বাবরি ওয়া আযাবিন্নার, ওয়া আন্‌তা আহলুল ওফায়ে ওয়ালহাক্কি আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু (মহিলা হলে আল্লাহুম্মাগফিরলাহা ওয়ারহামহা বলতে হবে)। ইন্নাকা আন্‌তাল গাফুরুর,রহীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক (নাম ও পিতার নাম) তোমার যিম্মাতে এবং তোমারই নিকটে। তাকে কবরের শাস্তি ও জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দাও, তুমিই পূর্ণ প্রতিদানের কর্তা ও ন্যায়ের মালিক। হে আল্লাহ ! তুমিই তো একমাত্র ক্ষমাশীল দয়াময়। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় তাকবীরের পর নিম্নলিখিত দু'আটি পড়াও জায়েয।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ

رُوْحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْلَهَا*

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বুহ ওয়া আন্‌তা খালাকতাহা ওয়া আন্‌তা হাদায়তাহা লিল ইসলামি ওয়া আন্‌তা কাবাযতা রুহাহা ওয়া আন্‌তা আ'লামু বিসিররিহা ওয়া আলানীয়্যাতিহা জি' না শুফা'আ ফাগ্‌ফিরলাহু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতের প্রভু, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ, তাকে ইসলামের জন্য হেদায়েত করেছ এবং তুমি তার রুহ কবয করেছ এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছ, আমরা তার জন্য সুপারিশ করতে এসেছি তুমি তাকে ক্ষমা কর। (আবূ দাউদ)

অতঃপর মাইয়েত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে হলে এই দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّذُخْرًا وَّاَجْرًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ'আলহু লানা ফারাতাওঁ ওয়া ছালাফাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়া আজরা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এই ছেলেকে করে দাও আমাদের জন্য প্রস্তুতির, স্থলাভিষিক্তের, সম্বলের এবং প্রতিদানের বস্তুরূপে।

[বুখারী (১) ১৭৮ পৃঃ, জামেউল উছুল ১৪৭ পৃষ্ঠা, বায়হাকী, নায়লুল আওতার]

মাইয়েত অপ্রাপ্তা বয়স্কা মেয়ে হলে- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ। "আল্লাহুম্মাজ আলহু" এর স্থলে - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا। "আল্লাহুম্মাজ আলহা" পাঠ করবে। এই দু'আ পাঠের পর ৪র্থ তকবীর বলে দুই হাত কান বা কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আবার বুকে বেঁধে সেই অবস্থায় ডাইনে বামে সালাম ফিরাবে।

জানাযার নামায সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য

জানাযার নামাযে অন্য নামাযের মত সূরা ফতিহা এবং অপর একটি সূরা পাঠ করতে হবে। নতুবা জানাযা হবে না। [বুখারী (১) ১৭৮ পৃঃ, নাসায়ী (১) ১৭৯ পৃঃ]

জানাযার নামাযে সূরা কিরা'আত এবং দু'আ দরুদ সরবে এবং নীরবে পড়ার হাদীস আছে। তবে তা'লীম বা সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য এবং অধিক মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সরবে পড়াই উত্তম।

জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর বাদেও অন্যান্য তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করা অর্থাৎ কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত দুহাত তোলা উত্তম। (দারকুতনী)

জানাযার নামাযে কেহ বা কিছু সংখ্যক লোক পিছনে পড়ে গেলে তার বা তাদের যেটুকু ছাড়া পড়েছে তা কাযা করবে। (মালেক, ৭৯ পৃষ্ঠা)

জানাযার নামায খোলা জায়গায় পড়বে। মসজিদে পড়াও জায়েয আছে। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)।

জানাযার নামাযে ৫ পাঁচ তাকবীর দেওয়াও দুরস্ত আছে তবে ৪ তাকবীরই উত্তম।

পাঁচ তাকবীর দিলে ৪র্থ তাকবীরের পর এই দেওয়া পাঠ করবেঃ-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ*

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ। ওয়া কিনা আযাবান নার।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহকালে এবং পরকালে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।

কেউ যদি জানাযার নামাযে ভুলবশতঃ চার তাকবীরের স্থলে তিন তাকবীরের পরই সালাম ফিরায় তবে আর এক তাকবীর দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরাবে। (বুখারী)

যদি বেশ কিছু লোক জানাযার নামায না পায়, তবে তারা ২য় জামাআত করতে পারবে। (বুখারী, মুসলিম কানযুল উম্মাল, ফতুয়া নাযিরিয়া)

কোন কারণে বিনা জানাযায় কবর দিয়ে ফেললে কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়বে। (তিরমিযী, দারকুতনী, নাইলুল আওতার)

সূর্যোদয়ের সময়, দ্বিপ্রহরে এবং সূর্যাস্তের সময় জানাযার নামায পড়া নিষেধ। (মুসলিম)

অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযার নামায জুতাসহ পড়া জায়েয আছে কিন্তু জুতাতে যেন কোন নাপাকী লেগে না থাকে। জুতা খুলে নামায পড়লে বামে বা পিছনে লোক না থাকলে বামে অথবা পিছনে রাখবে অন্যথায় দুই পায়ের মাঝখানে রাখবে। (আবূ দাউদ)

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত

সিহাহ সিত্তার হাদীসে জানাযায় নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবাদের থেকে এই মর্মে "কাওলী ও ফে'লী" উভয় বিধ সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, জানাযার নামাযে তারা সূরা ফাতিহা পড়েছেন এবং পড়তে বলেছেন।

عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة *

অর্থ : তালহা বলেন যে, আমি ইবনে আব্বাসের (রাঃ) পিছনে এক জানাযার নামায পড়েছি। তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং ফরমালেন যে, তোমরা জ্ঞাত হও যে, (জানাযার নামাযে) সূরা ফাতিহা পাঠ করা (নবী মোস্তফার) সুন্নাত। (বুখারী মিসরী ১মঃ ১৪৭ পৃষ্ঠা)

عن طلحة بن عبيد الله ان بن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال انه من السنة *

অর্থ : তালহা ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ফরমালেন, ইহা নবীর সুন্নাত। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

عن ام شريك الانصارية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا على الجنازة بفاتحة الكتاب *

অর্থ : উম্মে শরীক আনসারীয়া হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদিগকে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে আদেশ করেছেন। (ইবনে মাজাহ ১০৮ পৃঃ)

عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب*

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন। (ইবনেমাজাহ, ১০৮পৃঃ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন- এই মর্মে নিম্নবর্ণিত কিতাব সমূহেও উক্তরূপ স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (হাকিম, কিতাবুল উম শাফী, তাবরানী কাবীর, তাবরানী, আওসাত, বায়হাকী, মুনতাকা, ইবনুল জারুদ, মুহাল্লা শরহে মা'আনিল আসার লিত্ তাহাবী, দারকুতনী, মাজমুয়ায্ যাওয়ায়েদ, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা) দেখুন নসবুর রায়ার টিকা, মিসরী ছাপা ঃ (২য় খণ্ড) ২৭০,২৭১ পৃষ্ঠা)

জালীলুল কদর সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন। (বায়হাকী, ৪র্থ খঃ, ৩৯পৃষ্ঠা মুহাল্লা ৫ম খণ্ড ১২৯পৃষ্ঠা)

অর্থঃ মুজাহিদ তাবেয়ী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর ১৮ জন সাহাবীকে জানাযার নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা প্রত্যেকেই বললেন, তাকবীর দাও, তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ কর। তারপর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) প্রতি দরুদ পড়.................।

[বড়পীর সাহেবের গুনীয়াতুত্ তালেবীন, (২য় খণ্ড) ১৪৮ পৃষ্ঠা]

ফেকার মতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা

হানাফী ফেকার গ্রন্থেও জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার উল্লেখ আছে। আল্লামা আবুল হাসান শুরনুবুলালী (হানাফী) সাহেব জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র কিতাব প্রণয়ন করেছেন এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ উত্তম বলেছেন।

মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষৌভী (হানাফী) সাহেবও বলেছেন, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা উত্তম এবং ইহার দলীল সবল। (ইমামুল কালাম ঃ ২৩৮ পৃঃ)

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (হানাফী) সাহেব স্বীয় অছীয়ত নামায় লিখেছেন যে, আমার জানাযার নামাযে যেন সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয়।

(মালাবুদ্দা মিনহু, ৯৩ পৃষ্ঠা– ১৯১ পৃষ্ঠা।)

(জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার সপক্ষে হানাফী ফিকহের গ্রন্থ মুনিয়াতুল মুসাল্লীর শরাহ কাবিরী ও বাহরুর রায়েক ও কান্‌জুদ দাকায়েক এর শরাহ দ্রষ্টব্য)

মৃত সন্তানের জানাযা

প্রসবের পর মৃতবৎ সন্তানের মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণ পাওয়া গেলে অর্থাৎ কাঁদলে, হিক্কা দিলে বা নড়াচড়া করলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে।
(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকিম)

সন্তান মৃত ভূমিষ্ট হলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে না।
(নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

চার মাসের পূর্বে সন্তান গর্ভপাত হলে সর্বসম্মত মতে জানাযার নামায পড়তে হবে না এবং চার মাসের পর সন্তান গর্ভপাত হলে যদি জীবনের লক্ষণ পাওয়া যায় তবে সর্বসম্মত মতে তার জানাযা পড়তে হবে।

গায়েবানা জানাযা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবিসিনিয়ার বাদশাহ আসহামা নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ শুনে মদীনাতে জানাযায়ে-গায়েব পড়েছিলেন।
বুখারী, (১ম খণ্ড), ১৭৮ পৃষ্ঠা, মুসলিম (১) ৩০৯ পৃষ্ঠা।

একাধিক মুর্দার জানাযা

যদি কয়েকটি মুর্দা একত্রিত হয়, তবে সকলের জন্য এক সঙ্গে একবার জানাযা পড়লেই যথেষ্ঠ হবে। যদি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের লাশ একত্রিত হয়, তবে পুরুষের লাশ ইমামের নিকট ও স্ত্রীলোকের লাশ পুরুষ লাশের পশ্চিমে রাখবে। (মুসলিম)

ছোট ছেলে ও স্ত্রীলোকের লাশ একত্রিত হলে ছেলের লাশ ইমামের নিকট এবং স্ত্রীলোকের লাশ তার পশ্চিমে রাখবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

যদি তিন বা ততোধিক শ্রেণীর লাশ একত্রিত হয়, তবে প্রথমে বয়স্ক পুরুষের লাশকে ইমামের সম্মুখে, তারপর পশ্চিম পার্শ্বে ছেলেদেরকে এবং অতঃপর স্ত্রীলোকদের লাশ রাখবে। যদি কয়েক জন পুরুষ অথবা ছেলেদের লাশ একত্রিত হয় তাহলে যিনি বয়সে প্রবীণ এবং সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ তাকে ইমামের নিকট রাখবে। (ফতহুল কাদীর (২) ২৮৬ পৃষ্ঠা)

ফাসেক, বেনামাযী ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা

ফাসিক, বেনামাযী ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা আলিম উলামাগণ পড়বেনা। সাধারণ লোক দ্বারা পড়াবে যেন অন্য লোকেরা সতর্ক হয়ে যায়। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, নাইলুল আওতার, ফাতাওয়া নাযিরীয়া, যাদুল মা'আদ)

হজ্বের এহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জানাযা

হজ্বের এহরাম অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে গোসল দিতে কূলপাতা লাগাবেনা এবং তার মুখ ও মাথা কাফন পরাতে গিয়ে ঢাকবে না। কারণ সে ব্যক্তি হজ্বের দু'আ-(তালবীয়া) اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ এই দু'আ পাঠ করতে করতে হাশরের মাঠে উঠবে। [বুখারী (১) ১৬৯ পৃষ্ঠা, মুসলিম (১) ৩৮৪ পৃষ্ঠা]

শহীদের জানাযা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে শহীদদের জন্য জানাযার নামায পড়তেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রকাশ্যে এই দু'আ করতেন-

اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِىْ سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى ذَالِكَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাযা আব্দুকা খারাজা মুহাজিরান ফী সাবীলিকা, ফাকুতিলা শাহীদান ওয়া আনা শাহীদুন আলা যালিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা তোমার রাস্তায় গৃহ ত্যাগ করে বেরিয়েছিল। অতঃপর সে তোমার রাহে শহীদ হয়ে গেছে এবং আমি এই ব্যাপারে সাক্ষী আছি। [নাসায়ী (১) ২৭৭ পৃষ্ঠা, তাহাবী (১) ২৯১ পৃষ্ঠা]

শহীদকে বিনা গোসলে তার রক্ত ও গায়ের কাপড় চোপড়সহ দাফন করবে।

[বুখারী (১) ১৭৯ পৃঃ, আবূ দাউদ (২) ১৬৪ পৃঃ, নসবুর রায়া (১) ৩৬৬ পৃঃ]

জানাযার খাট বহন করা ও সাথে সাথে চলা

জানাযার খাট বহন করতে প্রথমে লাশের সম্মুখের দিকে মাথার ডান পাশ ডান কাঁধে নিয়ে কিছুদূর চলবে। তারপর পিছনের ডান পাশ ডান কাঁধে নিয়ে কিছুদূর চলবে। অতঃপর মাথার বাম পাশ বাম কাঁধে নিয়ে চলবে, পরে পিছনের বাম পাশ বাম কাঁধে নিয়ে চলবে। জানাযা বহনকালে মৃত ব্যক্তির মাথা সম্মুখে থাকবে। (আসরে মোহাম্মদ, মুগনী ইবনে কুদামা)

কমপক্ষে তিনবার জানাযার খাট কাঁধে নিলে তবে নিয়মিত কাঁধে নেওয়ার হক আদায় হবে। (তিরমিযী)

কবর পর্যন্ত লোকজন সাথে যাবে। ইহা মুর্দার প্রতি জীবিত ব্যক্তির হক। (বুখারী, মুসলিম)

লাশের ডাইনে, বামে ও পিছনে চলা দুরস্ত, কিন্তু আগে আগে চলা অনুচিত। (আবূ দাউদ)

দাফন প্রণালী

মৃত ব্যক্তিকে বহন করে নেওয়ার পর তার খাট পশ্চিম অথবা দক্ষিণ দিকে রেখে কবরে নামাবে এবং কবরে শোয়াবে। (আবূ দাউদ, বায়হাকী, ইবনে আবী শায়বাহ)

কবরে শোয়ায়ে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে ঃ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, আহমদ হাকিম)

অন্য রিওয়ায়াত নিম্নোক্ত দ'আ পাঠের কথা এসেছে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ।

আবশ্যক হলে দুই, তিন বা চারজন লোক কবরে নামতে পারে।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর কবরে চারজন নেমেছিলেন। (ইবনে হিশাম (২) ৬৬৩ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীলোকের কবরে মুহরিম (যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম) নামবে। স্বামীও নামতে পারে। মেয়েদের লাশ কবরস্থ করার সময় পরদা খাটান উচিত। (নাইলুল আওতার, সুবুলুস্সালাম)

মাটি দেওয়ার সময় দু'আ

দাফনকারীগণ লাশের মাথার দিক দিয়ে পর্যায়ক্রমে তিন মুষ্টি মাটি উভয় হাতে কবরের উপর দিবে। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারকুৎনী, বায্যার)

কোন কোন উলামা মাটি দেওয়ার সময়

প্রথম মুষ্টিতেঃ- مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ উচ্চারণঃ মিনহা খালাক্না-কুম।

দ্বিতীয় মুষ্টিতে ঃ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ উচ্চারণ ঃ ওয়াফীহা নু'য়ীদুকুম।

তৃতীয় মুষ্টিতে ঃ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى উচ্চারণ ঃ ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।

এইভাবে এ দু'আও পড়ার কথা বলেছেন। আর হাদীসে কেবলমাত্র এই কথা উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমের মৃত্যুর পর তাকে কবরে শোয়ায়ে مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ এই দু'আ পাঠ করেছিলেন। (হাকিম, বায়হাকী)

তবে হাদীসটি জঈফ।

কবর উঁচু করা, পানি ছিটা দেয়া ও খেজুরের ডাল পুঁতা

কবর সমতলভূমি থেকে অর্ধ হাত পরিমাণ উঁচু করবে, দেখতে যাতে উটের পিঠের মত মনে হয় এরূপ বানাবে। (বুখারী)

কবর দেওয়ার কাজ সমাধা করে কবরের মাথার দিক হতে পা পর্যন্ত (তিন বার) পানি ছিটিয়ে দিবে। (বায়হাকী, কিতাবুল উম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক সাহাবার কবরে কাঁচা খেজুরের ডাল পুঁতেছিলেন। এখনও কেউ পুঁতলে মাইয়েতের মাথা বরাবর পুঁতবে এবং মাত্র একটি পুঁতবে। (নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তিকাল ও কাফন দাফন

১১ হিঃ ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিবস মদীনাতে 'আয়িশার ঘরে জনাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিবি 'আয়িশার কোলে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেন। 'আয়িশা গর্ব করে বলেন, আমি ধন্য রমণী। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইবনে হিশাম (২) ৬৬১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকালের পর আয়িশা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে বালিশে মাথা রেখে শোয়ায়ে সেই ঘরে ছিলেন।
ইবনে হিশাম (২) ৬৬২ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর পরনে পরিহিত কাপড় না খুলেই ঐভাবে গোসল দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত ছয়জন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গোসল দিয়েছেন।

১। আলী ইবনে আবী তালিব, ২। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, ৩। ফজল ইবনে আব্বাস, ৪। উসামা ইবনে যায়েদ ৫। কুসসাম ইবনে আব্বাস এবং ৬। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোলাম শাকরান
ইবনে হিশাম (২) ৬৬২ পৃষ্ঠা।

তিন কাপড়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইয়হি ওয়া সাল্লাম) কে কাফন করা হয়েছিল, তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না। (বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর লহদ অর্থাৎ ভিতর দিকে গর্ত করা হয়েছিল। কবর কেটেছিলেন আবূ তালহা। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) যে বিছানায় ইন্তিকাল ফরমিয়েছিলেন সেই বিছানা সরায়ে সেইখানেই কবর কেটে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। [সীরাতে ইবনে হিশাম (২) ৬৬৩ পৃষ্ঠা]

বিনা ইমামতীতে পর্যায়ক্রমে কিছু সংখ্যক পুরুষ এবং পর্য্যায় ক্রমে মেয়ে মানুষ এবং শিশু উক্ত ঘরে প্রবেশ করে জানাযার নামায আদায় করেছেন।
(ইবনে হিশাম (২) ৬৬৩ পৃষ্ঠা)

বুধবার দিবাগত রাত্রি দুপুরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কে দাফন করা হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম (২) ৬৬৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরে ১। আলী ইবনে আবী তলেব, ২। ফযল ইবেন আব্বাস, ৩। কুসসাম ইবনে আব্বাছ এবং রাসূলুল্লাহর গোলাম, ৪। শাকরান, এই চারজন নেমেছিলেন।
[সীরাতে ইবনে হিশাম (২) ৬৬৪ পৃষ্ঠা]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাফনের সময় তার গোলাম শাকরান রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একখানা চাদর যাহা তিনি মাঝে মাঝে পরতেন এবং বিছানারূপে ব্যবহার করতেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরে দিয়ে দিলেন এবং তিনি বললেন, আল্লাহর কসম আপনার পর ইহা আর কেহ কোনদিন পরিধান করবে না। [সীরাতে ইবনে হিশাম (২) ৬৬৪ পৃষ্ঠা]

কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দু'আ

দাফন কার্য সমাধা করার পর সমবেত লোকজন কবরের নিকট দাঁড়ায়ে মৃত্যের আত্মার মাগফেরাতের জন্য এবং মুনকির নাকিরের সওয়ালের জওয়াব যাতে মূর্দা সঠিকভাবে দিতে পারে তজ্জন্য দু'আ করবে।
[আবু দাউদ, হাকিম (১) ৩৭০ পৃঃ, বায়হাকী (৪) ৫৬ পৃঃ]

এক কবরে একাধিক লাশ

কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, মহামারী, মড়ক, যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে একই সময়ে

বহু লোক মারা গেলে, প্রত্যেকের জন্য কবর করতে গেলে বহু কবর কাটতে হয়। তাতে খুব অসুবিধা হলে এবং সময় না জুটলে এক কবরে একাধিক লাশ অর্থাৎ ২/৩ জনকেও কবরস্থ করা জায়েয আছে।

(বুখারী, মিসরী ছাপা ১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

এরূপ প্রয়োজনে একাধিক মেয়েকেও এক কবরে দাফন করা দুরস্ত এবং বিশেষ প্রয়োজনে একই কবরে পুরুষ ও স্ত্রীলোককে একসঙ্গে দাফন করা জায়েয আছে। এমত অবস্থায় পুরুষকে প্রথমে এবং মেয়ে মানুষকে তার পশ্চাতে রাখবে। [মুসান্না আব্দুর রাজ্জাক, ফতহুল বারী (৩) ৯৩৯ পৃষ্ঠা]

পুরুষ এবং মেয়ে মানুষকে এক কবরে দাফন করলে উভয়ের মধ্যে মাটি দ্বারা বা কাঁচা ইট দ্বারা আড় করা উত্তম। [ফতহুল বারী (৩) ১৩৯ পৃষ্ঠা]

কবর চিহ্নিত করা

কোন কবরকে চিহ্নিত রাখার জন্য কবরের মাথার দিকে পাথর পুঁতে রাখা দুরস্ত আছে। (আবূদাউদ, ইবনে মাজা, মুগনী ৫০৪/৫০৫ পৃষ্ঠা)

সৎ উদ্দেশ্যে লাশ স্থানান্তরিত করা

মৃত ব্যক্তি যে স্থানে মারা যায় তাকে সে স্থানে দাফন করা উচিত। (তিরমিযী)

কোন সৎ উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করা জায়িয আছে। 'আয়িশার (রাঃ) ভ্রাতা আব্দুর রহমানের মৃত্যু "মাকামে হুবশী"তে (মক্কা হতে ১২ মাইল দূরে) হয়েছিল। তথা হতে তাকে মক্কায় এনে দাফন করা হয়।

তিরমিযী তুহফা সহ (২) ১৫৭ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে সা'আদ বিন আবি ওক্কাস ও সাঈদ বিন যায়িদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মৃত্যু "মাকামে আকীকে" হয় এবং তাদের লাশ মদীনায় নিয়ে দাফন করা হয়। (মুয়াত্তা মালিক, ২১৩ পৃঃ, বায়হাকী (৪) ৫৭ পৃষ্ঠা, মুগনী (২) ৫১০ পৃষ্ঠা)

প্রয়োজনে লাশ কবর থেকে উঠিয়ে অন্য স্থানে দাফন করা

কোন ব্যক্তিকে কোন কারণে অর্থাৎ বিশেষ অসুবিধা বশতঃ বিনা গোসল বিনা-কাফন ও বিনা জানাযায় কবরস্থ করা হলে তাকে গোসল, কাফন ও

জানাযার জন্য পুনরায় উত্থিত করা জায়িয। (বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

এবং যদি জানা যায় যে, লাশ পচেনি তাহলে তা প্রয়োজনে অন্যস্থানে দাফন করায় দোষ নাই। সাহাবীগণ থেকে এর প্রমাণ আছে।

(বুখারী, মুগনী ৩য় খণ্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা)

কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা

কবরে অবস্থিত লোক সাগরে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় (বিপদগ্রস্ত ও বিপন্ন)। সে তার জীবিত পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, পুত্র-কন্যা, স্বামী অথবা স্ত্রী এবং অন্যান্য আপনজনের নেক দু'আ ও সাদকা খায়রাতের নেকীর আশায় অধীর আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। যখন জীবিতরা তার আত্মার মঙ্গলের জন্য দু'আ, দান খয়রাত প্রভৃতি করে, তখনই সে তার ফসল পায় এবং কবরে তার শান্তি হয় ও আযাব বন্ধ হয়। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার জন্য অপর কেউ সাদকা খয়রাত করলে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়– এরূপ কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

[মুগনী (৩) ৫৬৮ পৃষ্ঠা]

বিশেষ করে নিজের পুত্র যদি পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে, তবে কবরে তারা তা পেয়ে থাকেন এবং তাদের আযাব হালকা হয়। (কিতাবুর রূহ, ১২ পৃষ্ঠা)

কবর যিয়ারাতের দু'আ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان زيارة القبور تزهد فى الدنيا وتذكر الاخرة *

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, তোমাদেরকে প্রথমে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন যিয়ারাত করবে (কেননা এখন তোমাদের ঈমান মজবুত হয়েছে)। কবর যিয়ারাতের ফলে তা দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আনে এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবর যিয়ারাতের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করতে বলেছেন ঃ (ইবনে মাজাহ)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاَنْتُمْ سَلَفُنَا

وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ *

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু 'আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ওয়া আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছার্।

অর্থঃ হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তোমাদেরকে এবং আমাদেরকে মাফ করুন। তোমরা আমাদের পূর্ববর্তী এবং আমরা তোমাদের পরবর্তী। অর্থাৎ তোমরা আমাদের পূর্বে কবরের বাসিন্দা হয়েছ আর আমরা তোমাদের পরে আসছি। (তিরমিযী)

নিম্নবর্ণিত দু'আও পাঠ করা জায়িয আছে।

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ *

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু 'আলা আহলিদ্ দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্‌তাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্‌তাখিরীনা ওয়া ইন্না ইন্‌শাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন, নাস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল 'আফীয়াতা।

অর্থ ঃ হে কবরস্থানের অধিবাসী মুমিন মুসলিমগণ! আমাদের মধ্যে যারা পূর্ববর্তী ও যারা পরবর্তী তাদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহর নিকট তোমাদের এবং আমাদের জন্য মুক্তি কামনা করি। [মুসলিম (১) ৩১৪ পৃষ্ঠা]

কবর যিয়ারাতের সময়

কবর যিয়ারাত করার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। তবে জুম'আর দিন (শুক্রবার) যিয়ারাত করা উত্তম (বায়হাকী)। শেষ রাত্রেও কবর যিয়ারাত করা ভাল। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) অধিকাংশ সময় শেষ রাতে "জান্নাতুল বাকী" নামক কবরস্থান যিয়ারাত করতেন। (মুসলিম)

যিয়ারত কালে দাঁড়িয়ে দু'আ পাঠ করবে। সাধারণতঃ মেয়ে লোকের পক্ষে যিয়ারত করা নিষেধ। তবে বিশেষ অবস্থায় মেয়েদের পক্ষেও যিয়ারত করা জায়িয আছে। জননী 'আয়িশা (রাঃ) তার স্বামী নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ও পিতা আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কবর যিয়ারাতে বিশেষ পর্দা করতেন না। কিন্তু উমর (রাঃ) কে তথায় কবর দেয়ার পর তিনি যিয়ারাতে বিশেষভাবে পর্দা অবলম্বন করতেন।

আহমদ, তিরমিযী, ফৎহুল বারী আলমুগনী)

মুরদার কবরের নিকট নিয়মিত কুরআন শরীফ পাঠ করা বা কুরআন খতম করা সম্বন্ধে কোন সহীহ হাদীস নেই। এ ব্যাপারে যে দু-একটি হাদীস বর্ণিত আছে তা সম্পূর্ণ জঈফ। (শরহুছ ছুন্নাহ, ১২৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম বায়হাকী ও তাবারানী এই মর্মে একটি মউকূফ হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন যে, মুরদাকে মাটি দেওয়ার পর তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রথম রুকু ও পায়ের কাছে শেষ রুকু পাঠ করা জায়িয।

[বায়হাকী (৪) ৫৬ পৃষ্ঠা, মাজমাউয যাওয়ায়িদ (৩) ৪৪ পৃষ্ঠা, ইবনুল কাউয়্যুমঃ কিতাবুর রুহ]

কবরের নিকট সূরা ইখলাস ও আয়াতুল কুরসী পড়া যেতে পারে। এটা ইমাম আহমদ হতে বর্ণিত। (আল মুগনী, ২য় খণ্ড, ৫৬৬ পৃষ্ঠা)

কবরের নিকট গিয়ে নিজের মউতের কথা স্মরণ করে কাঁদা জায়িয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাতার কবর যিয়ারাতের সময় ক্রন্দন করেছিলেন এবং সাহাবাগণও তাঁর সাথে কেঁদেছিলেন। (মুসলিম)

সওয়াব রেসানীর বিবরণ

মৃত ব্যক্তির জন্য দান খায়রাতের সওয়াব মৃত ব্যক্তিগণ পেয়ে থাকে। যেমন আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমার মাতা হঠাৎ ইন্তিকাল করেছেন; তিনি মৃত্যুর পূর্বে কথা বলতে পারেননি। আমার ধারণা যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে কথা বলার অবকাশ পেলে সাদকা খয়রাত করতেন। এখন যদি আমি তার পক্ষ থেকে খয়রাত করি তবে তিনি তার সওয়াব পাবেন কি ? "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, হাঁ পাবে।

[বুখারী, মুসলিম]

এই মর্মে আরও বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান আছে। সা'আদ নামক সাহাবা তার মার মৃত্যুর পর তার জন্য সাদকা করতে চাইলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তাকে জনসাধারণের জন্য পানির ব্যবস্থা (কুয়া ইত্যাদি) করতে বলেছিলেন। (নাসায়ী)

দৈহিক, শারীরিক এবাদত, যেমন কুরআন তিলাওয়াত করা, নামায পড়া, রোযা রাখা ইত্যাদির সওয়াব মৃত ব্যক্তি পায় কি না এ সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। মোল্লা আলী কারী (হানাফী) শরহে ফিকহে আকবার কিতাবে লিখেছেন ঃ

اختلف العلماء فى العبادات البدنية كالصوم والصلوة وقراءة القران والذكر فذهب ابو حنيفة واحمد وجمهور السلف الى وصولها والمشهور من مذهب الشافعى ومالك عدم وصولها

অর্থাৎ দৈহিক এবাদত, যেমন রোযা, নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও যিকরের সওয়াব মৃত ব্যক্তি পেয়ে থাকে কি না এতে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা এবং আহম্মদ ও অধিক সংখ্যক সলফে সালিহীনের মতে মৃত ব্যক্তির নিকট সওয়াব পৌছে থাকে। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেকের মাযহাব এই যে, মৃত ব্যক্তির নিকট এইসব আমলের সাওয়াব পৌছে না।

হাফেয জালাল উদ্দীন ছৈয়ূতী 'শরহিস সুদূর ফী হালাতি আসহাবিল কবূর' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

اختلف فى وصول ثواب القران للميت فجمهور السلف والائمة الثلاثة على الوصول وخالف فى ذالك امامنا الشافعى كذا فى المرقات *

অর্থাৎ কুরআন পাঠের সওয়াব মৃত ব্যক্তি পেয়ে থাকে কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা ও ইমামত্রয় অর্থাৎ আবূ হানীফা, মালেক ও আমহদ এর অভিমত এই যে, সওয়াব পৌছে থাকে এবং আমাদের ইমাম শাফিয়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, উহা পৌছেনা।

মাওলানা ওয়াহিদুয্ যামান লিখেছেন,

مذهب المحققين من اهل الحديث ان ثواب كل عبادة بدنية كانت

كختم القران او مالية كالصدقة يصل اليهم سواء اهدى لهم كل الثواب او نصفه او ربعة نص عليه الامام احمد وقال يصل الى الميت كل شيئ من صدقة وحج واعتكاف و قرائة القران والذكروغير ذالك *

অর্থাৎ মুহাক্কিক আহ্‌লে হাদীস আলেমদের সিদ্ধান্ত এই যে, দৈহিক এবাদত, যেমন খতমে কুরআন কিংবা মালী ইবাদত, যেমন সাদকা খয়রাতের সওয়াব মৃত ব্যক্তি পেয়ে থাকে– তাদের জন্য পূর্ণ সওয়াব হাদীয়া করা হোক কিংবা অর্ধেক অথবা সিকি বা কোন অংশ বিশেষ করা হোক সব অবস্থাতেই মৃত ব্যক্তি সওয়াব পাবে। ইমাম আহমদ এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তির নিকট সাদকাহ, নামায, হজ্ব, ইতেক্বাফ, কুরআন পাঠ, যিকর ইত্যাদি সব কিছুর সওয়াব পৌছে থাকে। [হাদীয়া তুলমাহ্‌দী (১) ১০৭ পৃঃ]

তবে সওয়াব রেসানীর জন্য শরীয়তে নির্দিষ্ট দিন ও নির্ধারিত সময় নিরূপণ করা হয় নাই। যে কোন দিবস যে কোন সময়ে মৃতের জন্য সাদকা, খয়রাত দু'আয়ে এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা যেতে পারে। নিয়মের বশবর্তী না হয়ে মৃতের জন্য দান, খয়রাত মিসকীনদের খানা খাওয়ান, মৃতের পক্ষ থেকে মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা স্থাপন, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, কূপ, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি খনন করে দেয়া, কুরআন, হাদীস, তাফসীর দ্বীনী কিতাব কিনে ওয়াক্‌ফ করা এবং লিল্লাহ্ ফলের বাগান করে দেওয়া ইত্যাদি জায়িয আছে। বরং এসব করা উত্তমও বটে। তাতে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়। সাদকায়ে জারিয়া যতদিন জারী থাকবে ততদিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি সওয়াব পেতে থাকবে।

মৃতের বাড়ীতে খাবার পাঠানো

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, তোমাদের নিকট আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়ীতে লোক মারা গেলে তোমরা তাদেরকে ঐ দিন খানা দিবে। কারণ তার আপনজনের বিয়োগ ব্যাথায় শোকাভিভূত থাকে। রান্না-বান্না করে খাওয়ার মত মানসিক ধৈর্য তখন তাদের থাকেনা। [বুখারী, মুসলিম,আবূ দাউদ (২) ১৬৪ পৃষ্ঠা, তিরমিযী (১) ১১৯ পৃষ্ঠা, তালখিসুল হাবীর (১) ১৬৮ পৃষ্ঠা]

মৃত ব্যক্তির কাযা রোযা

কোন ব্যক্তি রামাযান মাসে অসুস্থ হয়ে রোযা করতে না পেরে ঐ অবস্থায় মারা গেলে তার অলী বা ছেলেমেয়ে, স্বামী স্ত্রী অথবা নিকট আত্মীয় উক্ত রোযার কাযা আদায় করে দিবে। [বুখারী (১) ২১৩ পৃষ্ঠা]

মৃত ব্যক্তির কাযা নামায

মৃত ব্যক্তির কাযা নামায অন্যে পড়ার সহীহ হাদীস নেই। ইমাম মুসলিম এই মর্মে আলোচনা করেছেন।

কবর বাঁধান ও পাকা করা

কবর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন,

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه*

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কবরকে ইট দিয়ে বাঁধাতে এবং কবরের উপর বসতে ও উহাতে কোন ঘর বা গম্বুজ তৈরী করতে নিষেধ করেছে। [মুসলিম (১) ৩১২ পৃষ্ঠা]

অন্য এক হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি ততক্ষণ আজান শুনতে পায় যতক্ষণ পর্যন্ত কবর কাদা-মাটি দ্বারা লেপন না করা হয়। [মুগনী (৩) ৫০৭ পৃষ্ঠা]

ইমাম আবূ হানীফার (রহঃ) ওস্তাদের (ইব্রাহীম নখয়ী) কবরে পাকা ইট লাগান (অর্থাৎ কবর পাকা করা) খুব অপছন্দ করতেন। [মুগনী (২) ৫০৭ পৃষ্ঠা]

কবর পাকা করা, কবরে মৃত ব্যক্তির নাম-ধাম ইত্যাদি শিলালিপি করা, কবরে প্রদীপ জ্বালানো প্রভৃতি জঘণ্য বিদআত। অতএব মুসলমানের জন্য এইসব পরিত্যাজ্য।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেনঃ

لعن الله زوارات القبور والمتخذ عليهن المساجد والسروج *

অর্থাৎ কবর পরিদর্শনকারিণী, কবরকে মসজিদে রূপান্তরকারী এবং চেরাগ প্রজ্জ্বলনকারীকে আল্লাহ্ তায়ালা লা'নত করেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

কবর সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দোয়া করতেন ঃ

لا تجعل قبري وثنا يعبد *

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে এমন বুতখানায় পরিণত করো না যাতে পূজা পার্বন করা হবে। (সুনানে আরবাআ)

তিনি আরও বলেছেন ঃ لا تتخذوا قبري عيداً *

অর্থাৎঃ তোমরা আমার কবরকে ঈদমেলায় পরিণত করো না। (আবূদাউদ)

ইদানিং মানুষ কবরের প্রতি খুব বেশী আসক্তি প্রকাশ করছে। বহু টাকা পয়সা খরচ করে ইমারত ও গম্বুজ তৈরী করে শালু কাপড় ও মখমল উড়িয়ে সব সময় সেখানে কুরানখানীর, এমন কি সিজদা-সালাতের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, কবরস্থানের পার্শ্বে ওরছ ও কাওয়ালীর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এভাবে কবরকে আবাদ রাখা ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে নেহায়েৎ অন্যায় ও গর্হিত কাজ। অনেক ক্ষেত্রে তা শির্কের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। **বিশেষ করে মুর্দার নিকট কোন কিছু চাওয়া এবং মৃত ব্যক্তি জীবিতের কোন উপকার করতে পারে এরূপ ধারণা পোষণ করা শির্ক।**

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ফযীলত ও বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তার প্রতি দশটি রহমত নাযেল করেন, তার দশটি গুনাহ্ মাফ করেন

এবং দশগুণ ফযীলত বৃদ্ধি করে দেন। (নাসায়ী)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি সত্তরটি রহমত নাযিল করেন এবং ফিরিশ্‌তাগণ তার জন্য সত্তর বার ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন। (আহমদ)

এখন প্রশ্ন হল, দরূদের এই যে ফযীলত-উহা কোন দরূদ? সাহাবাগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমরা আপনার প্রতি কি ভাবে দরূদ সালাম পাঠ করবো? তিনি বললেন, তোমরা বলবেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

অর্থাৎঃ আত্তাহিয়াতুর পরে যে দরূদ পাঠ করা হয়, পূর্ণ সেই দরূদ তিনি পাঠ করতে বললেন। (বুখারী ও মুসলিম)

কতক লোকের একত্রে সমস্বরে সূর মিলিয়ে দরূদ পাঠের রীতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে, সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী, এমনকি ইমাম ও মুহাদ্দিসীনের যুগেও ছিল না। কাজেই এটা সম্পূর্ণ মনগড়া নতুন রসম বৈ আর কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, যে ব্যক্তি আমার নাম শুনে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না সে অত্যন্ত বখীল। (তিরমিযী, আহমদ)

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন, আমার নাম শুনে যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না, সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর নাম শুনে যে সংক্ষিপ্ত দরূদ পাঠ করতে হয় তা সিহাহ সিত্তা ও হাদীসের যাবতীয় কিতাবে বর্ণিত

আছে। তা হলো صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ যে ভাবে প্রচলিত মিলাদ মহফিল করা হয় সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠক-পাঠিকা ভাই বোনদেরকে বিচার বিবেচনা করার ও ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) জন্ম তারিখে তার নামে আয়োজিত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা বাস্তবিকই যদি নবীপ্রেম ও সওয়াবের কাজ হতো তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নবুওত প্রাপ্তির পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বৎসর সাহাবাগণ তেইশটি নবী জন্মবার্ষিকী পালন করলেন না কেন ? এমন কি লক্ষ লক্ষ সাহাবার মধ্যে একজনও ঐ তেইশ বছরের কোনও একটি বৎসর একটি বারও কেন মিলাদ মাহফিল করলেন না ? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর বিশেষ ভক্ত অনুরক্ত খুলাফায়ে রাশেদীন (প্রধান চারি খলিফা) আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) এবং লাখ লাখ সাহাবা (রাঃ) বহু দিন জীবিত ছিলেন। তাঁরাও কেন তাঁদের সারা জীবনে একবারও মিলাদ মাহফিল করলেন না। সাহাবীদের পর তাঁদের সন্তান সন্তুতি বহু লক্ষ ছিলেন। তাঁদের জীবনেও এই অনুষ্ঠান কেউ কোথাও একটি বারও কেন প্রতিপালন করলেন না ? তৎপর মহামতি ইমাম চতুষ্টয়, বিশেষ করে ইমামে আযম আবূ হানিফা (রহঃ) (জন্ম ৮০ হিঃ – মৃত্যু ১৫০ হিঃ) তাঁর ৭০ বৎসর জীবনের মধ্যে একবারও মিলাদ মাহফিল করার প্রয়োজন মনে করলেন না কেন? অধিকন্তু দুনিয়ার সর্বজন মান্য বুযুর্গ বড়পীর আব্দুল কাদির জ্বিলানী (রহঃ) (হিঃ ৪৭০ –৫৬১) তাঁর সুদীর্ঘ ৯১ একানব্বই বৎসরের জীবনে একটি বারও কেন মিলাদ মাহফিল করেননিন ? তারপরও শত শত বৎসর কেটে গেল এবং সেইসব শতাব্দীর মাঝেও বহু ইমাম, ফকীহ, অলী, দরবেশ, আলেম, ফাজেল চলে গেলেন, তাঁরাও কেন এই অনুষ্ঠান করলেন না ? মুসলিম জগতের উল্লিখিত মহান ব্যক্তিগণ জীবনে কেউ কোন দিনও মিলাদ মাহফিল করেন নাই তাহা ঐতিহাসিক মহাসত্য। তবে কি বলা যেতে পারে যে, বর্তমান যুগের মুসলমান অপেক্ষা তাঁদের নবী–প্রেম কম ছিল ? আদৌ নয়। কারণ যাঁরা নবীর সামান্য

সুন্নাত পালনের জন্য এবং তাঁর প্রতি মহব্বত প্রদর্শনের কারণে প্রাণপাত পর্যন্ত করতেন তাদের চাইতে কি আমাদের নবী-প্রেম বেশী ? কাজেই গভীর চিন্তার বিষয় এবং অখণ্ড মনোযোগ সহকারে স্থির মস্তিস্কে ভাববার কথা যে, প্রচলিত মিলাদ মাহফিল শরীয়াতের অঙ্গ এবং সওয়াবের কাজ কি করে হতে পারে ?

এই বিষয়ে আমি অতি সংক্ষেপে বহু বিখ্যাত কতিপয় বড় বড় আলেমের মতামত ও ফতোয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে ইতি করতে চাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষায় রচিত বহু কিতাব ছাড়াও প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের বিরুদ্ধে এবং এর অসারতা প্রমাণ করে বাংলা ভাষায় হানাফী আলেমগণও অনেক বই পুস্তক লিখেছেন।

তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বইগুলি পাঠকগণ পড়ে দেখতে পারেন ঃ-

পাক-ভারত আরবী ইলেমের প্রধান উৎস দেওবন্দ মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠতম আলেমদের মতামত ও উক্তি সম্বলিত ঃ

১। আহলে সুন্নাহ্ হানাফী দেওবন্দীগণের আকিদা

লেখক আলহাজ মাওলানা কাযী ওবায়দুর্ রহমান চৌধুরী, শিক্ষক চারিয়া মাদ্রাসা , চট্টগ্রাম।

২। হেদায়েত

লেখক মরহুম মাওলানা আব্দুল হাকীম এম, এ, এফ,এফ, ভূত পূর্ব প্রফেসর, আনন্দ মোহন কলেজ, মোমেনশাহী।

৩। সুন্নাত ও বিদ'আত -লেখকঃ মাওলানা আব্দুর রহীম।

খায়রুন প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মীলাদ সম্পর্কে প্রখ্যাত হানাফী আলেমদের মন্তব্য

(১) দেওবন্দের বিখ্যাত আলেম আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (হানাফী) সাহেব লিখেছেন ঃ

المولود الذى شاع فى هذا العصر واحدثه صوفى فى عهد سلطان اربل ٦٠٠ هـ ولم يكن له اصل من الشريعة الغراء، ولم يكن التصنيف فى هذه البدعة بليق بشان الحفاظ والمحدثين *

অর্থ ঃ- বর্তমান প্রচলিত মওলুদ-৬০০ হিজরীতে এরবলের সুলতানের যুগে চালু হয়। শরীয়াতে মুহাম্মদীয়াতে এর কোন অস্তিত্ব নেই এবং এই বিদআত সম্পর্কে এমন কোন কিতাব নেই যা হাফেয ও মুহাদ্দিসীনদের হাতে নেবার উপযুক্ত। (আল্ আরফুশ শাযী 'আল জামে তিরমিযী, ২৩২ পৃষ্ঠা)

(২) পাক-ভারত বিখ্যাত আলেম **মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী** (হানাফী) লিখেছেন, ''রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর ছয়শত বৎসর পর ও ইমাম আবূ হানিফার (রহঃ) সাড়ে চারশত বৎসর পর এই মিলাদ আবিস্কৃত হয়েছে। ৬০৪ হিজরীতে আমর বিন মুহাম্মদ কর্তৃক এটা প্রবর্তিত হয় এবং এরবল দেশের সুলতান মুযাফ্ফর উদ্দিন মালিকুল মুআযযম শাসনকর্তা হিসাবে প্রচলিত মিলাদকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই মিলাদ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের যুগে ছিল না। কাজেই ইহা বিদ'আত তাতে সন্দেহ নাই। (ফাতাওয়ায়ে মীলাদ)

(৩) **প্রখ্যাত আলেম ইমাম ইবনুলহাজ** (হানাফী) এবং

(৪) **আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকিহানী** (হানাফী) লিখেছেন,

بل هو بدعة احدثها البطالون و شهوة نفس اعتنى بها الاكلون

অর্থঃ বরং এটা (মিলাদ) বিদ'আত, মিথ্যাবাদীরা প্রবৃত্তি পরায়ণতা তথা পেট পূজার জন্য ইহা আবিষ্কার করেছেন। (মদখল, ফাতোয়ায়ে সাত্তারিয়া (১) (১৭৯ পৃষ্ঠা)

(৫) ভারত বিখ্যাত আলেম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (হানাফী) বলেন,

ایسی مجلس ناجائز ہے اور اسمیں شریک ہونا گناہ ہے اگر فخر عالم علیہ السلام کوحاضر ناظر جانکر کرے تو کفر ہے

অর্থ ঃ এইরূপ মিলাদ মহফিল নাজায়িয এবং তাতে যোগদান করা পাপের কাজ আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে হাযির নাযির মনে করে যদি তাঁকে সম্বোধন করা হয় তা হবে কুফর বা কাফেরীর কার্য ঃ (ফতোয়ায়ে রাশীদিয়া)

(৬) পাক-ভারত বিখ্যাত আলিম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী-(হানাফী) লিখেছেন,

اس طرح کی محفل سلف صالحین سے منقول نہیں

"প্রচলিত মিলাদ মহফিল অতীতের মুসলিম মণিষীগণ থেকে প্রমাণিত নয়।" (ইসলাহুর রুসুম, ৯০ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও লিখেছেন।

چنانچہ انکے کرنے میں جسقدر اہتمام ہوتا ہے نماز جمعہ وجماعت میں اسکا عشر عشیو بھی نہیں دیکھا جاتا اور انکے ترک سے جسقدر ناگواری ہوتی ہے فرائض و واجبات کے ترک سے ہرگیز ہرگیز نہیں ہوتی .... وہ محفل بھی غیر مشروع وممنوع ٹہریگی

অর্থ ঃ ফলকথা -মিলাদ অনুষ্ঠানের প্রতি যেরূপ গুরত্ব দেওয়া হয় জুম'আ ও জামাতের জন্য তার এক দশমাংশও দিতে দেখা যায় না এবং মিলাদ পরিত্যাগ করাতে যে পরিমাণ অসন্তুষ্টির প্রকাশ করা হয়, ফরয এবং ওয়াজেব কার্য পরিত্যাগ করাতেও কদাচ কখনও ঐরূপ অসন্তোষ প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয় না। কাজেই উক্ত মাহফিল শরীয়ত বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ। (ইসলাহুর রসুম-৮৯ পৃষ্ঠা)

মাওলানা থানবী সাহেব আরও বলেছেন,

میلاد مروج اور قیام مروج جو امور محدثہ و ممنوعہ کو مشتمل هی ناجائز اور بدعۃ هے

অর্থঃ প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম যা নবাবিষ্কৃত ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত তা নাজায়িয ও বিদআত। [বেহেশ্‌তী জেওর, (৬) ৯৭ পৃষ্ঠা]

তিনি আরও লিখেছেন,

چناکہ حق تعالی کا علم وقدرت دونوں کامل هیں اس لیے وہ ہر زمان ومکان میں حاضر و ناضر ہیں یہ اعتقاد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیاں او انبیاء اولیاء کے ساتہ کرنا اگر اس بنا پر هے کہ اپ کے لیے علم وقدرت

ذاتی ثابت کرنا ہے جیسا کہ بعض جہلاء کا عقیدہ ہے تب تو شرک ہے

অর্থঃ আল্লাহর ইলম ও কুদরাত উভয়ই কামেল, এইজন্য তিনি সর্বত্র হাজের নাজের। এই বিশ্বাস যদি কেউ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কিংবা অন্য কোন পয়গম্বর ও অলী সম্বন্ধে পোষণ করে এবং হাযের নাযের থাকা রসূলের ব্যক্তিগত ক্ষমতা মনে করে যা কতক মূর্খের আকীদা তবে উহা শের্ক (ইসলাহুর রুসুম, ৮৪ পৃষ্ঠা)

(৭) জগৎ বিখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (হানাফী) সাহেব স্বীয় ফতোয়ার কিতাবে মীলাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর লিখেছেন,

نہ اسکی اصل معتدبہ شرعا پائی جاتی ہے بلکہ بدعت ہے اور تارکین قیام پر ملامت کرنے والے مرتکب گناہ کئے ہے

অর্থঃ শরীয়ত বিধানে এর মূলে কোনই সত্যতা নেই, বরং ইহা বিদআত, কিয়াম বর্জনকারীকে যারা গালি দেয় তারা গুনাহগার –
[মজমুআয়ে ফতোয়া (২) ৩৩০ পৃষ্ঠা]

'আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ফরমিয়েছেন,

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد *

যদি কোন ব্যক্তি আমার শরীয়তের মধ্যে নতুন কাজ উদ্ভাবন করে যা শরীয়তে নেই তা (সেই নবাবিষ্কৃত কার্য) পরিত্যাজ্য। (বুখারী, মুসলিম)

ইব্রাহীম ইব্‌নে মায়সারা হতে বর্ণিত

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও ফরমিয়েছেন,

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الإسلام *

অর্থঃ যে ব্যক্তি বিদ'আত কারীকে এশ্রয় দেয় সে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করে। (বায়হাকী ও আবুল ঈমান)

অতএব সুর মিলিয়ে দরূদ পাঠ ও মীলাদ মহফিল পরিত্যাগ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অতি অবশ্য –অপরিহার্য কর্তব্য।

চট্টগ্রাম হাট হাজারী মাদরাসার আলিমদের ২৫টি ফতোয়া

বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসার হানাফী আলিম ও মুফতী -ছাহেবানের লিখিত ও প্রকাশিত "তুহফাতুল মু'মিনীন"

[সম্পাদক
আলহাজ্ব মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব (হানাফী)
প্রকাশকঃ
মাওঃ আব্দুল কাইউম সাহেব মুহাদ্দিস (হানাফী)
মাওঃ মুহাঃ কাছেম ফয়জী ছাহেব (হানাফী)]
কিতাবের ৫ম পৃঃ হতে ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(বিঃদ্রঃ- নিম্নলিখিত ফতোয়াগুলি সরাসরি হুবহু নকল করা হয়েছে, যাতে সাধু-চলিত ও আঞ্চলিকতার মিশ্রণ রয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদের কষ্টকরে পাঠ উদ্ধার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল।)

১নং ফতোয়া ঃ- ফাতিহা খানি

সূরা ফাতিহা ও কুরআন মাজীদের প্রভৃতি সূরা যা জানে ও যা পারে পড়লে অনেক ছওয়াব আছে। প্রত্যেক হরফে দশ নেকী লেখা যায়। নিজের ছোয়াবের জন্য পড়তে পারে ও অন্য কোন মাইয়েতের জন্য পড়তে পারে ; কিন্তু অন্যের দ্বারা সূরা ফাতেহা প্রভৃতি, খানা, শির্নি, রুটি প্রভৃতির উপর পড়া, অথবা পড়ান বেদআত ও হারাম এবং গুনাহ। কেউ কেউ বলে যে, চিজ সামনে না আনিলে দূরে রাখলে দোরস্ত আছে; এটা মিথ্যা কথা। পড়ার সঙ্গে চিজের কোন সম্পর্ক নাই। পড়তে ইচ্ছা হলে যা পারে যেই সময় পারে পড়ে মাইয়েতের জন্য সওয়াব পৌছাইতে পারে। গরীব মিছকীনকে খাওয়াইতে হলে যা পারে, যেই সময় পারে ছোয়াবের নিয়তে খাওয়াইলে ছোয়াব পৌছবে। কিন্তু চিজ সামনে আনিয়া বা দূরে রেখে তৎসম্পর্কতায় সূরা ফাতিহা প্রভৃতি পড়া পয়গম্বর সাহেব ও আছহাবগণ ও ইমামগণের জামানায় ছিল না; বরং বিদ'আত ও গুনাহ।

কোন সওয়াবের কাজ কিতাব মতে করলে অবশ্যই ছোয়াব পৌছবে।

মোল্লার দ্বারা পৌঁছাইতে হয় না। কেউ বলে যে, যদিও এই নিয়ম পুরাতন কালে ছিল না; আমরা যখন সওয়াবের জন্য করছি কেন গুনাহ হবে? তার জওয়াব এই, শরীয়তে যেভাবে আছে সেরূপ করতে হবে; বেশী কম করা নিষেধ। দেখ ঃ– মাগরিবের ফরজ নামাজ তিন রাকআত আছে, ছোয়াব বুঝে চার রাকআত পড়লে গুনাহ হবে ও নামাজ হবে না। অজুতে হাত কনুই পর্যন্ত ধুতে আছে, সওয়াব বুঝে বগল পর্যন্ত ধুলে গুনাহ হবে। ছুরজ (সূর্য) ডুবলে রোযা ইফতার করতে হয়, সওয়াব বুঝিয়া অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত রোজা রাখলে গুনাহ হবে। প্রত্যেক রাকআতে একটি রুকু আছে ছোয়াব বুঝে এক রাকআতে ২/৩ রুকু করলে হারাম হইবে ও নামায বাতিল হবে। সূরা ফাতেহা পড়লে অনেক সওয়াব আছে কিন্তু আত্তাহিয়াতু এর স্থলে পরিলে ওয়াজিব তরক করাতে গুনাহ হবে। ইত্যাদি মেছাল স্মরণ রাখলে তদ্বারা বেদ্আত ও শরীয়তের বৃদ্ধি কাজ এবং না জায়েয হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকবে না। চিজের উপর ফাতেহা দেয়া না জায়েয সম্বন্ধে অনেক কিতাবের অনেক দলীল আছে। বেশী দেখতে বিরক্ত বোধ হলে মিয়াতে মছায়েল কিতাবের ৭৯ পৃষ্ঠা, ছেরাতুল মোস্তাকীম কিতাবের ৫৪ পৃষ্ঠা, মছায়েলে আরবাঈনের ৩৭ পৃষ্ঠা, তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের ৭২ পৃষ্ঠা, ইত্যাদি কিতাব দেখুন।

২নং ফতোয়া ঃ- চাহারুম, চল্লিশা পালন করা

চাহারুম, চাল্লিসা, বৎসরী, ছয়মাসী ইত্যাদি রছমী ফাতিহা ও কার্যাদি শরীয়তে দোরস্ত নাই; বরং বেদআত ও গুনাহ।

দলীল ঃ তাকভিয়াতুল ঈমানের ৭২ ও ১৮০ পৃষ্ঠা, মিয়াতে মাছায়েলের ৩৫ পৃষ্ঠা, মছায়েলে আরবাঈনের ৩৬ পৃষ্ঠা, সিরাতুল মুসতাকীমের ৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

মাইয়েতের জন্য ছোয়াব পৌঁছাইতে হলে এই মত রছম না করিয়া চুপে চুপে গরীব মিছকিনকে যা পারে দিলে ও খাওয়াইলে সওয়াব হবে।

৩নং ফতোয়া ঃ- মোহাররম, সফর, রবিউল আওয়াল সাবানের চাঁদের বাড়া বাড়ী।

মোহর্‌রমের ৯/১০ তারিখে রোযা রাখা এবং রোযা রাখলে এক বছর গুনাহ মাফ হয় বলে কিতাবে আছে। কিন্তু পাঁচ দিন্না সির্নি ও দশ দিন্না হপ্ত দানা

ইত্যাদি রছম বিদআত ও গুনাহ। ছফর চাঁদের চারি সম্বায় গোছল বিদআত ও শিরক কার্য। রবিউল আউয়াল চাঁদে ফাতিহা দোয়াজ দহম ও ওরসে নবী, ফকীর দরবেশগণের ওরস বিদআত ও গুনাহ। রজব চাঁদের মেরাজের রাত্রে লোক একত্র হয়ে নামায পড়া ও খানা, মেজবানি করা বিদআত। শাবান চাঁদে শবে-বরাতের দিন রোযা রাখা, রাত্রে ইবাদাত করা কিতাবে সাবিত আছে, কিন্তু হালুয়া রুটি তৈয়ার করা ও ফাতিহা দেয়া ও মোল্লার দ্বারা কবর জিয়ারত করান গুনাহ ও বিদআত। রামাযান চাঁদে শবে-কদরের তালাশ করা ও রাত্রে ইবাদত করা অনেক সওয়াব। কিন্তু সূরা ও রকাৎ নির্দিষ্ট করে নামায পড়া এবং রুটি গোস্ত তৈয়ার করে মোল্লা-মিয়াজী বুলাইয়া ফাতিহা করান ও কবর জেয়ারত করান গুনাহ ও বিদআত। শাওয়াল চাঁদে ছয়টি রোযা রাখা ছুন্নাত ও বড় সওয়াব। কিন্তু রোজা শেষ হইলে কোন দ্রব্য ফাতেহা করা ও ছয় রোজা উত্তীর্ণ করা বিদআত।

দলীল ঃ কুরআন মাজীদের সূরা আনামের ১৭ রুকু, সূরা আরাফের ৪ রুকু , সূরা ইউনুছের ২,৬,৮ রুকু, সূরা আরাফের ৪ রুকু, সূরা শু'আরার ৩ রুকু ও মিয়াতে মাছায়েল ও ছেরাতুল মোস্তাকিম, ও মাছাবাত বিচ্ছুন্নাহ প্রভৃতি কিতাব দেখুন।

৪নং ফতোয়া ঃ- জানাযা, জিয়ারত, তাহলিল ও কবরপারে কুরআনখানি

ছোয়াবের জন্য এবাদত করিয়া টাকা পয়সা লওয়া দেওয়া হারাম ও গুনাহ কবীরা, যেমন জানাযার নামায পড়াইয়া, জেয়ারত করাইয়া, তহলীল, কোরান শরীফ পড়াইয়া, কোরান শরীফ ঘরে বা কবরের পাড়ে পড়াইয়া, টাকা পয়সা লওয়া দেওয়া অজুহাতে হউক বা লিল্লা নাম দিয়া হউক কোন মতে জায়েয নাই এবং হারাম।

তাহাতে কোন ছোয়াব নাই, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে গুনাগার। এই প্রকারের খয়রাত হারাম সম্বন্ধে অসংখ্য প্রমাণ আছে।

দলীল ঃ কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ৫ম রুকু, সূরা আনামের ১০ রুকু, সূরা ইউনুছের ৮ম রুকু, সূরা ইউছুফের ১১ রুকু, সূরা শু'আরার ৩ রুকু, সূরা ছাবার ৬ রুকু, সূরা ইয়াছিনের ২য় রুকু, সূরা দাহারের ১ম রুকু, সূরা লাম

ইয়াকুনের ৫ম আয়াত, মেশ্‌কাত শরীফের ১৯০/১৯১/১৯২/১৯৩ পৃষ্ঠার হাদীস; ফতোয়া আলোমগিরীর ৪র্থ জিলদের ৩৮১ পৃষ্ঠা ফতোয়া শ্বামির ৫ম জিলদের ৩৬ পৃষ্ঠা, হেদায়া আখিরাইনের ২৮৭ পৃষ্ঠা, তনকি ফতোয়া হামিদিয়ার ২য় জিলদের ৩৭ পৃষ্ঠা, ফতোয়া খায়রিয়ার জিল্‌দ ছানির ৩৪১ পৃষ্ঠা, কশ্‌ফুল গোম্মার ১ জিলদের ৮৪ পৃষ্ঠা, ২য় জিলদের ২২ পৃষ্ঠা, ইছলাহুর রছুমের ১৪৭ পৃষ্ঠায় এবং আলমগীরি মিশ্রী ছাপার ৬ষ্ঠ জিলদের ২১১/২১২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৫নং ফতোয়া ঃ- কবর যিয়ারত

জানাযার নামায ফরজে কেফায় বটে। জানাযাতে হাজির হইলে অনেক সওয়াব আছে; কিন্তু পয়সা দিয়া জানাজার নামাজ পড়ান ও জানাজার নামায পড়াইয়া মোল্লা–মৌলবীগণকে খয়রাত ও লিল্লা নাম দিয়া লওয়া দেওয়া বিদ্‌আত ও গুনাহ কবীরা। কবর জিয়ারত নিজে নিজে একাকী করা সুন্নাত ও অনেক ছোয়াব আছে কিন্তু অন্যের দ্বারা জিয়ারতের জামাআত করান অথবা জিয়ারত করাইয়া আজুরা লিল্লা বলিয়া খয়রাত দেওয়া লওয়া হারাম ও ছোয়াব নাই বা গুনাহ কবীরা। তাহলিল অর্থাৎ 'লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' পড়ায় অনেক সওয়াব আছে। সকল মুসলমান যে যেই কদর (পরিমাণ) পারে পড়িবে, মাইয়েতের ওয়ারিশেও যে সময় যে কদর পারে পড়িয়া ছোয়াব পৌছাইতে পারে। কিন্তু খয়রাত দিয়া তাহলিল পড়ান বেদাআত ও গুনাহ কবীরা। মাইয়েতের ছোয়াব রেছানির জন্য সমস্ত কুরআন অথবা কুরআনের সূরা যাহা জানা পড়িয়ে ছোয়াব পৌছাইতে পারে। কিন্তু খয়রাত দিয়া কুরআন শরীফ পড়ানোর ছোয়াব কিছুই নাই বরং গুনাহ কবীরা। এই সব কথার দলীল কুরআন হাদীসে ও ফেকায় অনেক আছে। কিছু জানিতে চাহিলে ৪র্থ দফায় উল্লিখিত কিতাব দেখুন।

৬নং ফতোয়া ঃ মাইয়েতের দাফন কাফনের সময় সাদকা করা

পয়গাম্বর ছাহেবের জামানায় ও আছহাবগণের জামানায় এবং ইমামগণের জামানায় জানাযার ও তাহলিলের খয়রাত ছিল না; পয়গাম্বর ছাহেবের অফাত শরীফে ও আবূ বকর ছিদ্দিক, ওমর, বিবি আয়েশা, বিবি ফাতিমা, আলী, উসমান ও আবূ হুরায়রা, বেলাল রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম প্রভৃতির ইন্তেকালের সময় ও দাফনের সময় দিরহাম, দিনার, খোরমা, গেঁও জও প্রভৃতি কোন প্রকারের খয়রাত করেন নাই; সমস্ত হাদীস ও ফেকায় মওতের ও জানাযার

বয়ান দেখুন। মাইয়েতের কাফন দাফনের সময় দান সদ্কা করা বেদ্বীনির রছম বলিয়া মাছায়েলে আরবাইনের ২৯ মাসআলা ৩১ পৃষ্ঠাতে লিখা আছে।

৭ নং ফতোয়া ঃ কুরআন মজিদ শিক্ষা দিয়ে, ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ দিয়ে টাকা পয়সা লওয়া

শুদ্ধভাবে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়া, দোয়া কালামুল্লাহ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করিয়া, তাবিজ দিয়া, রোগব্যাধি ও দুনিয়াবী কোন মকসুদ তলবের জন্য ওওবা পড়িয়া টাকা পয়সা লওয়া, দেওয়া হালাল ও দুরস্ত আছে।

দলীল ঃ হেদায়া আখিরাইনের ৩৮৭ পৃষ্ঠা, তন্‌কি ফতোয়া হামিদিয়ার ২য় জিলদের ১৩৭ পৃষ্ঠা, ফতোয়া শামির ৫ম জিলদের ৩৬ পৃষ্ঠা থেকে ৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, কাশফুল গোম্মার ২য় জিল্‌দের ২২ পৃষ্ঠা, তফছির আজিজিয়া ও তফছির ইবনে কাছির সূরা বাকারার ৫রুকুর তাফসীর দেখুন। কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও তাবিজ দিয়া, দাওয়াত পড়িয়া টাকা পয়সা লওয়া, দেওয়া দুরস্ত আছে বলিয়া জানাযা, যিয়ারত প্রভৃতি উল্লেখিত ইবাদতে টাকা পয়সা লওয়া, দেওয়া দুরস্ত থেকে পারে না। কারণ, এই সকল কাজ আখেরাতে সাওয়াবের জন্য করা যায় না বরং দুনিয়ার ফায়দার জন্য করা যায়; ইহা চিকিৎসালয় গণ্য, এই জন্য তাহাতে টাকা পয়সা লওয়া দুরস্ত আছে। যিয়ারত জানাযা প্রভৃতি সাওয়াবের কার্য এইজন্য তাহাতে টাকা পয়সা লওয়া দুরস্ত নাই।

৮নং ফতোয়া ঃ- জানাযা জিয়ারত করে টাকা পয়সা লওয়া

যে সব মোল্লা-মৌলভী জানাযা, যিয়ারত, তাহলীল, কুরআন খতম ইত্যাদি ইবাদত করিয়া টাকা পয়সা লওয়ার ব্যবসা করিয়াছে তারা বিদআতী, ফাসেকী ও হারামখোরী কার্য করিতেছে। তদ্‌নিমিত্ত তাহাদিগকে ইমাম নিযুক্ত করা, তাহাদের নিকট তাওবাহ করা ও মুরীদ হওয়া দুরস্ত নাই।

দলীল ঃ কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ১৫ রুকুর তৃতীয় আয়াতঃ সূরা ইয়াসীনের ২য় রুকুর নবম আয়াতঃ কেফায়ার প্রথম জিলদের ১২৭ পৃষ্ঠা, শরহে বেকায়ার ১ম জিলদের ১৭৫ পৃষ্ঠা, আসআতুল লোমআত ২য় জিল্‌দের ১৫৫/১৫৬/১৬০ পৃষ্ঠা, ফতওয়া শামীর ৫ম জিল্‌দের ৩৬ পৃষ্ঠা, কওলুল জামীলের ২০ পৃষ্ঠা, তালীমুদ্দিন কিতাবের ৭২ ও ৯৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

৯ নং ফতোয়া ঃ- দরূদ শরীফ পড়া

দরূদ শরীফ পড়া অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। একবার দরূদ পড়িলে তার উপর দশবার আল্লাহ তায়ালার রহমত হয়। অন্যান্য অজিফা সারিয়া সর্বদা দরূদ পড়িলে সাওয়াব বেশী হইবে বলিয়া হাদীস শরীফে আছে। কিন্তু ওয়াজের মজলিসে বা অন্য কোন জামা'আতে শোর করিয়া সকলে মিলিয়া দরূদ পড়া বেদআত ও গোনাহ।

দলীল ঃ কুরআন মাজীদের সূরা আ'রাফের ৭ রুকু, মাক্তুবাতে ইমাম রব্বানী ১ম জিল্‌দের ৩৩৪ পৃষ্ঠা, মিয়াতে মাসায়েলে ৯৯ পৃষ্ঠা, ফতওয়াঃ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহঃ) ১ম জিল্‌দের ১২৩ পৃষ্ঠা ফতওয়া সিরাজিয়ার দুয়ার বাব ৭২ পৃষ্ঠা ও হিসনে হাসীনে দেখুন।

১০ নং ফতোয়া ঃ- স্ত্রীলোকের পক্ষে হালাল পশু জবেহ্ করা

মুসলমান মাত্রই পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই বিস্‌মিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার বলিয়া মোরগ প্রভৃতি জবেহ্ করিতে পারেন। কোন মোল্লা-মৌলভী ও অন্য কোন দোয়া বা নিয়াতের আবশ্যকতা নাই।

দলীলঃ ফাতাওয়া কাজী খাঁ ৪র্থ জিল্‌দের ৭৫৭ পৃষ্ঠা, আলমগীরীর ৪র্থ জিল্‌দের ৯৫ পৃষ্ঠা, হেদায়ার শরহে কিফায়ার ৪র্থ জিল্‌দের ৫৪ পৃষ্ঠার ও ফেকার সমস্ত কিতাবে জবেহের বাব দেখুন।

১১ নং ফতোয়া ঃ- কুরবানীর পশু নিজে জবেহ্ করা

কুরবানীর গরু, ছাগল নিজে জবেহ করা সুন্নাত ও অত্যন্ত ভাল; পীড়িত, মেয়েলোক পর্দার ওজরে অন্যের দ্বারা জবেহ করাইতে পারে; কিন্তু কুরবানীর গোস্ত ও চামড়া দিয়া অন্যের দ্বারা জবেহ করলে কুরবানী দুরস্ত হইবে না।

দলীলঃ নববীর শরাহ সহীহ্ মুসলিম শরীফের ২য় জিল্‌দের ১৫৫ পৃষ্ঠার হাদীস ও উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা সহ দেখুন; হেদায়ার শরেহ কেফায়ার ৪র্থ জিল্‌দের ৭৪ পৃষ্ঠা, কাজী খাঁর ৪র্থ জিল্‌দের ৭৪৯ পৃষ্ঠা, আলমগীরীর ৪র্থ জিল্‌দের ১০৬ পৃষ্ঠা, ফেকাহার শরাহ হেদায়ার ৪র্থ জিল্‌দের ৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

১২ নং ফতোয়া ঃ- কোন দিন, চাঁদ ও মাসকে খারাপ জানা

কোন দিন, চাঁদ এবং মাসকে নজর মানা এবং নহস জানা কোফরি শিরিকী

কার্য, যেমন সোম শনিবারে পূর্বদিকে না যাওয়া, ছফর চাঁদকে খারাপ বুঝা, জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ না করা, অমাবশ্যায়, পূর্ণিমায় যাতায়াত না করা, রবিবারে বাঁশ না কাটা, খালী কলসী দেখিলে কুছাত বুঝা, কাক ডাকিলে মানুষ মরে বলিয়া বুঝা, রাত্রে সিন্দুক থেকে টাকা না দেওয়া, বুধবারে গোলা থেকে ধান না বের করা, এই সকল মানা শিরক বটে।

দলীলঃ কুরআন মাজীদের সূরা আরাফের ২৩ রুকু, সূরা ইউনূসের ২/৪/৫/১১ রুকু, সূরা আনামের ৭রুকু দেখ।

১৩ নং ফতোয়া ঃ- নামায রোযা ব্যতীত ফকীরি কেমন

যে সব ফকীর রাসূলের শরীয়ত মানেনা, নামায পড়েনা, রোজা রাখেনা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও সিজদা ও কবরে সিজদা করে, গান গায় ও বাজনা বাজায়, নাচে, কুদে, আল্লাহকে চাহে, রাসূলকে না চাহে, বলে মারফত শরীয়ত হতে পৃথক। বলে আল্লাহ তা'আলা কে দেখে বলিয়া কহে। নামায মনে মনে পড়ে বলিয়া কহে। মেয়েলোক সামনে আনিয়া নাচায় ও মূরিদ করায় প্রভৃতি কোফরি কার্য করে, তারা ফকির নহে; তারা প্রকৃত কাফের ও তারা শয়তানের দল। ইহাতে যেই কেহ সন্দেহ করে সেও কাফের।

দলীল ঃ কুরআন শরীফের সূরা নেছার ২১ রুকুতে ৯/১০ আয়াত দেখুন; সূরা আলে-এমরানের ৪র্থ রুকু ১ম ও ২য় আয়াত দেখুন; সূরা নেছার ৮/৯ রুকু দেখুন, আল ফোরকান কিতাবের ৭০ পৃঃ থেকে ৮০ পৃঃ পর্যন্ত দেখুন, মিয়াতে মাছায়েল কিতাবের ১১০ পৃঃ থেকে ১৩৮ পৃঃ পর্যন্ত দেখুন, কুরআন শরীফের সূরা মায়েদার ৭ রুকু ফতোয়া আজিজির ৬৮ থেকে ৭০ পৃঃ দেখুন।

১৪ নং ফতোয়া ঃ- বিবাহে বাড়াবাড়ী

দুলহিনের অলি ও কুটুম্বগণ দুলা থেকে বা দুলার অলি থেকে বিবাহ উপলক্ষে দুলহিনের জেওর, মোহর ও সাজ সিঙ্গার ব্যতীত দাফা খরচ, লোয়াজিমা, পান, বাতাসা, নাপিত, ধোপা, মোল্লা, মিএাজি, আঁকবারানী, শোভা মানানী, মাইনের বাতেশার পাতিলার টাকা ইত্যাদি দ্রব্যাদি দাবিয়ে বা খশিয়ে বা হাদিয়া তোফা নাম দিয়া যাহা লয় সমস্তই হারাম।

দলীল ঃ ফতোয়া শ্বামির ৫ম জিল্দের ২২১ পৃঃ ও ফতোয়া শ্বামির ২য় জিল্দের ৩৭৫ ও ৩৭৬ পৃঃ, ফতোয়া কাজি খাঁ ১ম জিল্দের ১৭৮ পৃঃ দেখুন।

১৫ নং ফতোয়া ঃ- ওলা উঠার সময় তদবীরে বাড়াবাড়ী

ওলা ওঠার সময় লীখম্ ছাতুনের বাঁওটা মহল্লায় ও গ্রামে গ্রামে দেওয়া ও কালা ছাগল ঘুমাইয়া মঘের ন্যায় গ্রাম খাঙ্ক করা ও বড় পীর ছাহেবের নামে চার দানা শির্ণি দেওয়া প্রভৃতি শিরক ও কোফরী কার্য।

দলীল ঃ কুরআন শরীফের সূরা বাকারার ৩য় রুকুর ২য় আয়াত দেখুন, সূরা আনামের ৫,৭,৮ রুকু দেখুন, সূরা আরাফের ২৩,২৪ রুকু দেখুন, সূরা ইউনুছের ২,৫,১১ রুকু দেখুন।

১৬ নং ফতোয়া জমিন বন্ধকী কওলা

জমিন স্থিত বন্ধক লইয়া মুনাফা খাওয়া প্রকৃত সুদ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ ও ইখতেলাফ নাই; ঐ বন্ধকী জমির রাজস্ব কর বন্ধক দাতা আদায় করে বা বন্ধক গ্রহীতা, আদায় করে, কোন মতে বন্ধকী জমির মুনাফা খাওয়া দোরস্ত নাই। অতএব জমি বন্ধক লইয়া মুনাফা খাওয়া প্রকৃত সুদ, এক সুদের ৭০ গুনাহ, সত্তর গুনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট গুনাহ যেন আপন মাতার সঙ্গে জেনা করা। তহবিল বন্ধক, বিক্রী কবলা করিয়া টাকা দিলে জমি ফেরত দিবে বলিয়া একরার নামা লওয়া ও কট বন্ধক লওয়া, মেয়াদ অন্তরে ব্যয়বাদ সিদ্ধ করা ব্যয়-বিল অফা লওয়া সমস্ত বন্ধকীর হুকুম ও তার মুনাফা খাওয়া সুদ। বায়বিল-অফাকিতাব মতে বন্ধকও রেহেনের ন্যায় সুদ। এই সমস্ত কথার অনেক দলীল আছে। কয়েকটা কিতাবের দলীল দেওয়া যাইতেছে।

দলীল ঃ ফতোয়া স্বামীর ৫ম জিলদের ৩২০ ও ৩৪৭ পৃঃ, ফতোয়া কাজি খাঁ ২য় জিল্দের ৩৪৭ পৃঃ, তন্কি ফতোয়া হামিদিয়া ১ম জিল্দের ২১৮ ও ২৫২ পৃঃ, তান্কি ফতোয়া হামিদিয়া ২য় জিল্দের ২৫৩ ও ২৫৪ পৃঃ, মেশকাত শরীফ ২৪৬ পৃঃ, আলমগিরীতে কিতাবুল বয়ু দেখুন। যেই সব আলেমগণ স্থিত বন্ধক দোরস্ত রাখে ও বায়বিল্ অফা দোরস্ত করে তারা সুদী ও ফাছেক। তাদের পিছে নামায দোরস্ত নাই। দুররুল মোখতার ও ছগীর ও ফতোয়া শামির ইমামতির বাব্ দেখুন।

* (বায়বিল্ অফার বিষয়ে মুফতীয়ে আজম মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব ফরমাইয়াছেন ঃ-

بيع الوفاء مسلئة مختلف فيهة ست ـ نزد بعضے أں بيع فاسدست ونزد بعضے بيع باطل و نزد بعضے آں رهن ست ـ اما مشائخ سمرقند آں رابيع جائز گفته اند ـ ميلان صاحب هدايه نيز بهمين سوست ـ بعض فقهائے متاخرين فتوى هم برين قول داده اند ـ چنانچه در شامي والبحر الرائق وغير هما بتفصيل اين مسئله مرقوم ست ـ

অর্থাৎ বায়বিল্ অফা (বিক্রি কবলা করিয়া টাকা দিলে জমি ফেরৎ দিবে বলিয়া একরার নামা লওয়া) সম্বন্ধে ওলামাদের এখতেলাফ আছে। কেউ বলেন যে, ঐরূপ বেচা বিক্রী ফাছেদ ও কেউ বলেন ঐ রূপ বেচা বাতেল এবং কাহারও মতে তাহা বন্ধক হয়। অবশ্য সমরকন্ধের ফকীহগণ তাহাকে জায়েয বিক্রি বলিয়াছেন। হেদায়া ওয়ালার মত সেদিকে অনুভব হইতেছে। কোন কোন পরবর্তী ফকীহরাও উক্ত মতানুরূপ ফতওয়া দিয়াছেন। এটা ফতোয়া শ্বামি ও বাহরুররায়েক প্রভৃতি কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অতএবঃ ইহা দ্বারা জানা গেল যে এই কিতাবে মোতাকাদ্দিমীন অর্থাৎ পূর্ববর্তী ফকিহগণের মধ্যে যাহারা ঐরূপ বেচাবিক্রীকে ফাছেদ ও বাতেল বলিয়াছেন, তাহাদের মতানুসারে লিখা হইয়াছিল। (মোহাম্মদ ইউসুফ ইছলামাবাদী))

১৭ নং ফতোয়া ঃ- সামর্থবান ব্যক্তির পক্ষে ভিক্ষা করা

যেই ব্যক্তির কামাই-কছব করিবার শক্তি আছে; সেই ব্যক্তির ভিক্ষা মাগা দোরস্ত নাই; যাহার নিকট একদিনের খোরাক আছে তার জন্যও ভিক্ষা করা হারাম। মজালেছুল আব্‌রার কিতাবের ৪৬৪ পৃঃ, মেশকাত শরীফের ১৬৩ পৃঃ হাদীছ দেখুন। মোসলমানগণ সাবধান থাকিবেন; ভিক্ষা পেশা হারাম কার্যকে লোকেরা সুবিধা বিবেচনা করিয়া কি পুরুষ কি স্ত্রী অনেকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে; এবং ঐ প্রকার কাজকে হালাল বুঝিতেছে। হারামকে হালাল বুঝিলে কাফের হয়। সাবধান ! সাবধান !!

১৮ নং ফতোয়া ঃ ফালনামা ও তালেনামা এবং রাশীনামা কেমন

ফালনামা ও তালেনামা ও রাশীনামা ইত্যাদি গণনা ও বিশ্বাস করা ও ফাল

কিতাব দেখিয়া কাহার কি হইয়াছে ও হইবে কহা-বলা করা ও কোনদিন কোন সময় ছায়াৎ, নহছ হইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা কোফরি কার্য। আল্লাহতালা ব্যতীত কেউই গায়েব জানেনা। ভিক্ষাজীবি কাট মোল্লাগণ চাউল ও পয়সার জন্য ফালনামা খুলিয়া গায়েবী কথা মিছামিছি কহিয়া নিজেও কাফের হইতেছে, অন্য লোককেও কাফের বানাইতেছে; তাহারা প্রকৃত মোশরেক; তাহাদের পীছে নামাজ দোরস্ত নাই।

দলীল ঃ কুরআন শরীফের সূরা আনআমের রুকু ৫,৭, সূরা হুদের ৩,৪ রুকু, সূরা নামালের ৫ রুকু ও সমস্ত ফেকার যবহের বাব দেখুন।

১৯ নং ফতোয়া ঃ মওলুদ শরীফ পড়া কি ?

পয়গম্বর ছাহেবের আহওয়াল অবস্থাদি কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ ও ছিয়ার অর্থাৎ পয়গাম্বর ছাহেবের জীবন চরিত কিতাবসকল থেকে বয়ান করা ও শুনা সওয়াব বলিয়া ছাবেত আছে কিন্ত ভিক্ষাজীবি মৌলবীগণ টাকা পয়সা রুজি করিবার জন্য মৌলুদ শরীফ নাম দিয়া নানা প্রকারের মিছামিছি কাহিনী, হিন্দি কিতাব থেকে জঈফ, বেছনদি রেওয়ায়াত সকল বয়ান করিয়া থাকে, জাক জমকের সহিত উর্দ্দু ফারছি গজল সকল পড়িয়া থাকে ও স্ত্রী পুরুষকে শুনাইয়া গীতের মত শেএর পড়িয়া থাকে ও আওয়াম স্ত্রী পুরুষেরা ইহাতে মগ্ন হয়; আবার ইহাকে সওয়াব বুঝে ও মানত করে এই প্রকার মিলাদ শরীফ পয়গম্বর সাহেব আছহাব ও ইমামগণের জমানায় ছিল না। বরং বেদআত ও গুনাহ।

দলীলঃ মেশ্‌কাত শরীফ, মদখল, মাকতূবাতে ইমাম রব্বানী, বরাহিনে কাতেয়া, ফতোয়ায়ে মীলাদ, এছলাহুর রছুম; মিয়াতে মাছায়েল, তাজ্‌কিরুল ইখ্‌ওয়ান প্রভৃতি কিতাবে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখা আছে।

২০ নং ফতোয়া ঃ- কবরের উপর ঘর বাঁধা, কবর পাকা করা ও কবরে চেরাগ দেয়া কি ?

কবরের উপর ঘর বাঁধা ও কবর পাকা করা ও কবরে চেরাগ দেওয়া বেদাআত, হারাম, গুনাহ কবীরা ও আল্লাহ্‌র লানত।

দলীল ঃ মেশকাত শরীফে ও ফতোয়া শ্বামিতে কবরস্থানের বয়ান দেখুন।

২১ নং ফতোয়া ঃ- বিনা ওজরে মসজিদে নামায পড়া কি ?

রামাযানের ও কুরবানীর দুই ঈদের নামায খোলা ময়দানে বড় জামাআত-

করিয়া পড়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদা; পয়গাম্বর ছাহেব সর্ব্বদা ময়দানে ঈদ পড়িতেন; কেবল বৃষ্টির গতিকে একবার মসজিদে পড়িয়াছেন; বিনা ওজরে ঈদের নামাজ মসজিদে ও ছোট ছোট ঈদখোলায় পড়া বেদাআত । মদখল ২য় জিল্দ ঈদের নামাজের বয়ান, ছিফ্রুছ ছা'আদাত, মাদারেজুন নবুয়ত, জাদুল মায়াদ, হেদায়া শরেহ বেকায়া, ফতোয়া শামী প্রভৃতি কিতাব ঈদের নামাযের বয়ান দেখুন। ভিক্ষাজীবি মোল্লা মৌলবীগণ অল্প অল্প চাউল পয়সার জন্য আওয়াম মুসলমানকে ঈদগাহের বড় বড় জামা'আতে যাইতে বাধা দিয়ে রাসূলের সুন্নাত (তরীকা) বিরোধী হয় তারা কখনও রসূলের নায়েব থেকে পারেনা; তারা প্রকৃত আল্লাহ ও রাসূলের দুশমণ। এই কথার দলীল কুরআনে এবং হাদীছে ভরপুর।

২২ নং ফতোয়া ঃ- আল্লাহ ছাড়া কোন পীর ও দরগার নামে শির্নী মানসা কি ?

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন পীরের নাম বা দারগাহ কবরের নামে গরু, ছাগল শির্ণি মানত করা শিরক ও কুফ্রী কার্য। ঐ মানসীয় বস্তু কতয়ী হারাম।

দলীলঃ তফছির আজিজিতে সূরা বাকারার ২১ রুকু দেখুন, ফতোয়া শ্বামির ২য় জিল্দে নজরের রয়ান দেখুন। আল্লার ওয়াস্তে শির্ণি করিবে বলিয়া গরু, ছাগল মানত করিলে অথবা আল্লার নামে গরু শির্ণি ও ছাগল শির্ণি ইত্যাদি শির্ণি মানিলে সে সকল বস্তু নিজে খাইতে পরিবেন না, নিজের বেটা বেটি, মা-বাপ, নানা-নানী, দাদা-দাদী, বিবি এবং যেই ব্যক্তি যাকাৎ ফিতরা লইতে না পারে তাহাদিগকে খাওয়াইতে পারিবে না, খাওয়াইলে তারা হারাম খাইবে, শির্ণি আদায় হইবে না। ফেকার কিতাবে নজরের বাব দেখুন।

২৩ নং ফতোয়া ঃ- সন্তান জন্মিলে বাড়াবাড়ি

সন্তান জন্মিলে সপ্তম দিবসে সন্তানের মাথা মুড়ান ও সে দিন নাম রাখা ও আকিকা করা ছুন্নত। মেশকাত শরীফের আকিকার বাব ৩৬২ পৃঃ দেখুন। পাঁচদিন্না কামানী, পান, তৈল ও ছটি, চেরাগ দিয়া নাম রাখা, বেল পাতা পোড়া প্রভৃতি বেদাআত ও শিরক, গুনাহ।

দলীল ঃ সূরা বাকারার ২৯ রুকু, মছএলে আর্ব্বাঈনের ৩২ পৃঃ।

২৪ নং ফতোয়া ঃ- ওহাবী লা-মাযহাবী কারা ?

অনেক মৌলভীগণ ঘুষখোর, সুদখোর বে-নামাযি তামশাগিরি ইত্যাদী

ফাছেক বেদাতির বাড়িতে বাড়িতে যায় ও খায়, ঘরে এক কথা মেলা মজলিশে আরেক কথা বলে। মজলিশ যেই মতে খোশ হয় সেই মত ওয়াজ করে, খোদার এবাদত করিয়া পেট পালে ও এতিমের মাল খাইতে ভয় করে না। দেশ দেশান্তরে যাইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় ভিক্ষা করে, এলমের বড়াই করে। এই প্রকারের খাছিয়ত এহুদি আলেমগণের ছিল। তাহাদিগকে আল্লাহ তালা কুরআনে গাধা বলিয়া ছেন। এহুদি খাছিয়তের আলেমের পায়রবী করিলে রসূলের তরিকা মতে কখনও চলিতে পারিবেনা। এহুদি খাছিয়তের মৌলবীরা হক প্রচারক আলেমগণকে ওহাবি লা-মাজহাবি বলিয়া আম লোককে ধোকা দেয়, কিন্তু প্রকৃত লা-মাজহাবি উক্ত এহুদি খাছিয়ত মৌলভীগণ।* কেননা তারা রাছুলের এবং ইমাম আবূ হানিফার উল্টা চলিতেছে। ৮ নং মাছালার দলীল দেখুন।

২৫ নং ফতোয়া ঃ- শরীয়ত অমান্য কারীর আশ্চর্য কার্যকলাপ কেমন

যে যতই আল্লাহ তালার প্রিয় হোক না কেন যত দিন আপন হৃদয়ে জ্ঞান ও বোধ আছে শরীয়তের বাধা থাকা ফরজ; রোযা, নামাজ ইত্যাদি কোন এবাদত মাফ হতে পারে না; আর কোন গুনার কার্য ও (তার) দোরস্ত হতে পারে না। যদি তার দ্বারা কোন আশ্চর্য কর্যকলাপ প্রকাশ হয়, তাহা হলে যাদু'গর নতুবা শয়তানের ধাঁধাঁ' এই ব্যক্তির প্রতি এতেকাদ করা গুনাহ। (কুরআন, হাদীস, ফেকাহ ও আকায়েদের কিতাব এবং ১৩ নং মছালার দলীল দেখুন।)

---

* ঃ {অর্থাৎ তারা যখন কুরআন হাদীছ, ফেকার মোতাবার কিতাবের বিপরীত কাজ করিয়া থাকে তাই তারা ছুন্নী হানফীতে কিছুতেই থাকতে পারে না ; বরং তারা উক্ত কারণে বেদ্‌আতী ও লা-মাজহাবী। এমন কি যেহেতু তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবীদের (রাঃ) বিপরীত কাজ করিয়াছে। তাই তারা দুশমন আবুলাহাবের তরীকা অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদিগকে "লাহাবী"ও বলা যাইতে পারে। তারা যে হক প্রচারক ছুন্নী হানাফী আলেমগণকে "ওহাবী" বলিয়া থাকে তার অর্থ কি ? ভাবিয়া দেখা উচিত। যদি বলা হয় যে তা وهاب "ওহাব" শব্দ থেকে গঠিত তখন বলা যেতে পারে যে, وهاب (ওহাব) অর্থ দাতা এবং আল্লাহতালার ৯৯ নাম থেকে একটি তখন, وهابي (ওহাবী) শব্দের অর্থ হইবে দাতা ও সখী অথবা "আল্লাহ্ ওয়ালা"। যদি বলা হয় তাহা وهابي শব্দ থেকে وهاب শব্দ গঠিত, তখন وهابي অর্থ দান করা। সুতরাং وهابي (ওহাবী) আরবী শব্দ হইলে অর্থ হইবে প্রদত্ত এবং উর্দ্দু শব্দ হইলে অর্থ দাতা ও সখী। সমস্ত লোগাতের কিতাব (আরবীর অভিধান) দ্রষ্টব্য। অতএব ইহা কোন অপমানের কথা নহে গৌরবের কথাই والفضل ماشهدت به العدو অর্থাৎ শত্রু যে বিষয়ে সাক্ষি দেয় তাহাতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।}

ঋণ মুক্তির দু'আ

ঋণ-গ্রস্ত ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এই দু'আ তিন বার পাঠ করবেন এবং সাথে সাথে নিয়ত পরিশোধ করার চেষ্টা করবেন ইনশা আল্লাহ ঋণমুক্ত হতে পারবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْهَزَنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসলি ওয়া আউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ্ দায়নি ওয়া কাহরির রিজালি আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন্ হারামিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়াক।

অর্থঃ প্রভু হে, আমি দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা ও অপারগতা, কাপুরুষতা ও কার্পণ্য, ঋণগ্রস্ততার প্রকোপ ও অন্যের বশ্যতা থেকে তোমার আশ্রয় চাইতেছি। প্রভু হে! আমাকে তোমার হালাল জিনিস দান করত হারাম থেকে মুক্ত করয়া দাও এবং আমার উপরে তোমার করুণাধারা এমনভাবে বর্ষণ কর যাতে আমি কারও মুখাপেক্ষী না হই। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)

শত্রু থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ

শত্রুর শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকতে হলে সদাসর্বদা এই দু'আ পড়বেন এবং পড়ার সময় শত্রুর চেহারা নিজের মনের মধ্যে এঁতে রাখবেন।

দু'আটি এই ঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থঃ প্রভু হে! আমরা তোমাকেই তাদের বিপক্ষে দাঁড় করাচ্ছি এবং তাদের শত্রুতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (হিসনে হাসীন)

সূর্যোদয়ের দু'আ

সূর্যোদয় দেখে এই দু'আ পড়তে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর।

অর্থঃ প্রভু হে! একমাত্র তোমার অনুগ্রহকে সম্বল করে আমরা সকাল ও সন্ধ্যা অতিক্রম করে থাকি। তোমার অনুগ্রহেই আমরা জীবিত আছি আর তোমার অনুগ্রহকে সম্বল করেই আমরা মরব। তোমার নিকটেই পুনর্গমন করতে হবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দু'আ

সূর্যাস্ত দেখে এই দু'আ পড়তে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর।"

অর্থঃ প্রভু হে! একমাত্র তোমার অনুগ্রহকে সম্বল করে আমরা সন্ধ্যা ও সকাল অতিক্রম করে থাকি। তোমার অনুগ্রহেই আমরা জীবিত আছি আর তোমার অনুগ্রহকে সম্বল করে আমরা মরব। কবর থেকে উত্থিত হয়ে তোমার কাছেই যেতে হবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

(সূর্যাস্তের সময় আমসাইনা আগে এবং সূর্যোদয়ের সময় আসবাহনা আগে বলতে হবে)

শোয়ার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাই) এবং জীবিত হই।

ঘুম থেকে উঠার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন আর তাঁরই নিকট (আমাদের) ফিরে যেতে হবে। (বুখারি)

হাঁচি দিলে দু'আ ও তার জবাবে দু'আ ঃ-

হাঁচি আসলে "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" (আলহামদু লিল্লাহ) বলবে। যে শুনতে পাবে সে উত্তরে "يَرْحَمُكَ اللّٰهُ" (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বলবে এবং ইহা শুনে হাঁচিদাতা বলবে, يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম। (মিশকাত)

আয়না দেখার দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ وَحَرِّمْ وَجْهِىْ عَلَى النَّارِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাস্সানতা খালক্বী ফাহাস্সিন খুলুক্বী ওয়াহার্রিম ওয়াজহী 'আলান্নার।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে (মানুষরূপে) খুবই সুন্দর করেছ। সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর কর। আর আমার চেহারাকে দোযখ থেকে বাঁচাও। (মেশকাত)

খাবার উপস্থিত হলে দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত'য়িমনা খাইরাম মিনহু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য এতে বরকত দাও। এবং এটা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আমাদের খাওয়াও। (তিরমিযী, আবূদাউদ)

খাবার শুরু ও শেষে দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ বলে খাবার শুরু করতে হয় এবং খাওয়ার শেষে বলতে হয় ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ *

উঃ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আত'আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়াজা'আলানা মুসলিমীন।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে পানাহার করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাতের সময় দু'আ

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর্ রাদু বিহামদিহী ওয়াল মালায়িকাতু মিন খীফাতিহী।

অর্থ ঃ পবিত্র ঐ সত্তা বজ্র ও সকল ফিরিশতাগণ যাহার ভয়ে তাঁহার তাসবীহ ও প্রশংসা করে। (মুয়াত্তা মালিক)

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-তাক্বতুলনা বিগাযাবিকা ওয়া-লা-তুহলিকনা বি'আযাবিকা ওয়া'আফিনা ক্বাবলা যালিক।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমাদিগকে তোমার গযব দ্বারা মারিওনা এবং তোমার আযাব দ্বারা ধ্বংস করিওনা এবং উহার পূর্বেই আমাদিগকে নিরাপত্তা দান করিও। (মুয়াত্তা মালিক)

স্বামী-স্ত্রী মিলনের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাক্তানা।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ ! তুমি আমাদিগকে শায়তান

হতে রক্ষা কর এবং তুমি আমাদিগকে যে রিযিক (সন্তান) দান করবে তাকেও শয়তান হতে রক্ষা কর।

যানবাহনে আরোহনের সময় দু'আ

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীনা অ-ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন।

অর্থ ঃ "পবিত্রতা ঘোষণা করছি মহান প্রভুর যিনি আমাদের জন্য বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে আয়ত্বে আনতে পারতাম না। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।"

কাউকে বিদায় দেয়ার সময় দু'আ

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ *

উচ্চারণ ঃ আসতাউদি'উল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াত্বীমা 'আমালিক।

৭। অর্থ ঃ আপনাদের দ্বীন, আমানত এবং অমঙ্গলের শেষ পরিণতি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিলাম। (আহমদ ২/৭, তিরমিযি ৫/৪৯৯)

বাজারে প্রবেশের দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকালাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুওয়া হাইউন লা ইয়ামূতু বিইয়াদিহীল খাইরু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁর। তিনি মৃত্যু ও জীবন দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ ও তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (তিরমিযী ৫/৪৯১, হাকিম ১/৫৩৮)

বাতাস প্রবাহিত হলে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا ٭

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্‌রিহা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমরা তোমার কাছে এর মঙ্গল প্রার্থনা করছি ও এর অমঙ্গল হতে পানাহ চাচ্ছি। (আবূ দাউদ ৪/৩২৬, ইবনে মাজাহ ২/১২২৮)

ক্রোধান্বিত হলে দু'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٭

উচ্চারণ ঃ আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী ৭/৯৯, মুসলিম ৪/২০১৫)

শির্‌ক হতে বেঁচে থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا اَعْلَمُهُ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উশরিকা বিকা শাইয়ান আ'লামুহূ ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ'লামুহূ।

১৬। অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমার জ্ঞাতসারে তোমার সাথে কাউকে শরীক করা হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজ্ঞাতসারে তোমার সাথে কাউকে শরীক করে ফেললে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আহমদ ৪/৪০৩)

বাগানে মুকুল দেখা দিলে দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا ٭

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী সামারিনা, ওয়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া বারিক লানা ফী সা'য়িনা ও বারিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের ফলে বরকত দাও, আমাদের শহরে বরকত দাও। আমাদের সা'এ (বড় পরিমাপে) ও মুদ এ (ছোট পরিমাপে) বরকত দাও। (মুসলিম ২/১০০০)

খুশীর সময় দু'আ

سُبْحَانَ اللّٰهِ উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ উচ্চাঃ আল্লাহু আকবার। অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসলিম ৪/১৮৫৭)

কাউকে গালি দিলে তার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ফাইমান মু'মিনান সাবাবতাহু ফাজ'আল যালিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ যে মু'মিনকে গালি দেয়া হয় তা তার জন্য কাল কেয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য লাভের উছিলা বানাও। (মুসলিম ৪/২০০৭)

পোষাক পরিধানের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়ারাযাক্বানীহি মিন গাইর হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওওয়াতিন।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এ পোশাক পরিধান করার তাওফীক দিয়েছেন ও আমার শক্তি-সামর্থ ছাড়াই এটা আমাকে দান করেছেন। (তিরমিযী)

পোষাক খোলার সময় দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহ। অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি। (তিরমিযি ২/৫০৫)

মজলিস বা সভা শেষে দু'আ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগ্‌ফিরুকা ওয়াতূবু ইলাইকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ দিচ্ছি তুমি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। আর তোমার নিকট তাওবাহ করছি। (তিরমিযী)

ইফতারের সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া 'আলা রিযকিকা আফতারতু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ একমাত্র তোমার জন্যই রোযা পালন করেছি এবং তোমার দেয়া রিয্‌ক দ্বারা ইফতার করছি।

ইফতারের পর দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ যাহাবায্ যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল 'উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।

অর্থ ঃ পিপাসা দূর হয়েছে, শিরা উপশিরাগুলো সতেজ হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ সওয়াবও নির্ধারণ হয়েছে। (আবূ দাউদ ২খণ্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা)

নতুন চাঁদ দেখলে দু'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ، وَالْاِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিলআমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলামি, ওয়াত্‌তাওফীকি লিমা তুহিব্‌বু ওয়া তারযা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ ! তুমি যা পছন্দ করো ও সন্তুষ্ট হও সেটাই

আমাদের নসীব করো। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমার (এ চাঁদের) প্রতিপালক।
(তিরমিযী ৫/৫০৪)

বাড়িতে প্রবেশের আদব ও দু'আ

বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমে সালাম দিতে হবে। তারপর নিম্নের দু'আ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না আসআলুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া-খাইরাল মাখরাজে বিসমিল্লাহি ওযালাজনা ওয়া'আলাল্লাহি রাব্বুনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি এবং বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহ্র নামে ভরসা করলাম। (আবূদাঊদ)

উপরে উঠার সময় ও নীচে অবতরণ করার সময় দু'আ

উপরে উঠার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ আকবার) বলতে হয় এবং নীচে নামার সময় سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) বলতে হয়।

সালাম ও মুসাফাহার দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আসসালামু আলাইকুম) বলে সালাম দিতে হয়।

এবং তার জবাবে বলতে হয় وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ)। আর মুসাফাহা করার সময় বলতে হয়

نَحْمَدُ اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ উচ্চারণ ঃ নাহমাদুল্লাহা ওয়া নাসতাগফিরুহু।

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামী'উল 'আলীম

تمت بالخير